সমাজতাত্ত্বিক এমিল দুর্খায়েম

অশোক কুমার ভাদুড়ী

প্রয়াত অধ্যাপক আমার শিক্ষক

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে

মুখবন্ধ

সমাজতাত্ত্বিক এমিল দুর্খায়েম সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার ইতিহাসে এক অন্যতম দিকপাল। সমাজতত্ত্বকে তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে, বিষয়নিষ্ঠভাবে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর সামাজিক তথ্য (Social Facts) সম্পর্কে বিশ্লেষণ পদ্ধতিগত ও তাত্ত্বিক উভযদিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। দুর্খায়েমের নাম উচ্চারিত হয়, কোঁৎ, মার্ক্স, হ্বেবাবের সঙ্গে। আমার গ্রন্থ সাম্মানিক এবং স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লেখা। তাদেব উপকাবে এলেই আমার পরিশ্রম সার্থক বলে মনে কববো। আমি দুর্খায়েম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিষযগতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি কিন্তু সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীকে বর্জন করিনি। এ গ্রন্থে নতুন কিছু হযতো নেই তবু মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহৃদয় অধ্যাপকবন্ধুগণ যদি এর মধ্যে কোন নতুনত্বের সন্ধান পান, তবে সেটা হবে আমার উপরি পাওনা। তাঁদেব সদর্থক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনার জন্য অপেক্ষা করে থাকবো যাতে পরবর্তী সংস্করণে সম্মার্জনা করতে পারি। আমার গ্রন্থের প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাই।

অশোক কুমার ভাদুড়ী

সূচীপত্র

ভূমিকা

We wish to construct our exposition solely on factual material, endeavouring as far as we can,to present only facts in a general form —*Karl Marx*

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপর্বে ফবাসী সামাজিক-অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংকট ঘনীভূত হচ্ছিল। ১৮৪৮ সালেব বিপ্লব থেকেই ফবাসী সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ক্রমাগত বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যিক ব্যবস্থার আবির্ভাব হচ্ছিল। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব মানব ইতিহাসেব এক অসামান্য বিপ্লব। কারণ এই বিপ্লব থেকেই প্রাচীন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আগমনী বার্তা ঘোষিত হয়েছিল। এই বিপ্লব বুর্জোয়া শ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিল; সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই বিপ্লব ছিল যুগান্তকারী। বুর্জোয়া ব্যবস্থাও ছিল নিশ্চিত ভাবেই সামন্তবাদী ব্যবস্থার থেকে এক গুণগত অগ্রপদক্ষেপ। কিন্তু ফরাসী সমাজব্যবস্থার পক্ষে বুর্জোয়া বিপ্লবের সুফল বেশিদিন কার্যকরী থাকেনি। কিছুদিন পরেই ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্তবাদের সঙ্গে আপোস বফায় আসে এবং পুরোনো রাজবংশ ক্ষমতায় ফিরে আসে। ফলে, বুর্জোয়া বিকাশ পুরোপুরি সাফল্য লাভ করতে পাবেনি; সমাজে প্রাচীন যুগের শ্রেণীগুলোর পুরো ধ্বংসও হয়নি। ফলে, বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেকে যথাযথভাবে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। কার্ল মার্কস তাঁর **এইটিনথ্ ব্রুমেয়ার** ও **ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম** গ্রন্থগুলিতে সঠিকভাবেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে কিভাবে তৃতীয় নেপোলিয়ন নানা প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর সাথে আপোস রফা করে রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে জোরদার করে তুলেছিলেন। এক্ষেত্রে তার প্রধান সহায় হয়েছিল ধনী কৃষক, পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী ও ধনিকদের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর উচ্ছন্নে যাওয়া বর্জিত অংশ, মার্কস যাকে 'লুম্পেন প্রোলিতারিয়েত' বলে অভিহিত করেছেন। মার্কস তাই নেপলিয়ানকে এই পরগাছাদের প্রতিনিধি বলে অভিহিত করেছিলেন। এর পর ১৮৭১ সালে শ্রমিক শ্রেণী প্যারিস বিপ্লব সমাধা করে এবং মাত্র কিছুদিনের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়; ইতিহাসেরই নির্মম পরিহাসে শ্রমিক শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ নানা ধরনের দুর্বলতার কারণে বুর্জোয়া শ্রেণী অসামান্য ধূর্ততা ও দক্ষতায় সেই বিপ্লব ও তার নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে তথাকথিত 'শান্তি প্রতিষ্ঠার' নামে। ***কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে শুধু হিংসা বা বলপ্রয়োগ করে ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব ছিল না, (কোন শ্রেণীর পক্ষেই সম্ভব হয় না) তাই প্রয়োজন ছিল মতাদর্শগত তত্ত্ব নির্মাণের। এই মতাদর্শগত তত্ত্ব নির্মাণ শুধু রাজনৈতিক দিক থেকেই গুরুত্বপূণ নয়, সামাজিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। ফরাসী সমাজতত্ত্ব এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সমাজতাত্ত্বিক সাঁ সিমঁ সমাজতন্ত্রের কথা বললেও তাঁর মন্ত্রশিষ্য অগাস্ত কোঁৎ উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর মতাদর্শগত বৈধতা দেবার সামাজিক তত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন। ঠিক তেমনিভাবে, এমিল দুর্খায়েম বিশৃঙ্খলতা ও সংকটে দীর্ণ বুর্জোয়া ব্যবস্থার 'সামাজিক শৃঙ্খলা'***

রক্ষার সামাজিক তাত্ত্বিক ভিত্তি যুগিয়েছিলেন, অনেক বেশী দক্ষতা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করে।

উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সামাজিক- রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার তত্ত্ব নির্মাণে এমিল দুর্খায়েম (১৮৫৮-১৯১৭) অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন। সমাজতত্ত্ব বিষয়টির জন্মস্থান ফ্রান্স হওয়াতে দুর্খায়েম তাঁর পূর্বসূরীদের কাছ থেকে অনেকটাই সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন এবং তাকে আরো পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও বৈজ্ঞানিক বিষযনিষ্ঠতাব সঙ্গে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পেরেছিলেন। দুর্খায়েম তাঁব মতাদর্শগত, তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত আধার পেয়েছিলেন ফরাসী জ্ঞানদীপ্তি যুগের *(Age of Enlightenment)* মন্তেস্কু,কনডোরসেট এবং রুশোর রচনাবলী থেকে এবং পরবর্তীকালে সাঁ সিমঁ ও কোঁৎ - এর 'সামাজিক আলোচনার' তাত্ত্বিক ধারণা থেকে। কোঁৎ - এর পদ্ধতিগত ক্ষেত্রের অবদানকে তিনি তাঁব সামাজিক তত্ত্ব নির্মাণে ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়াও তিনি কান্টের নীতিবিদ্যা ও ভুন্ডট্ এর লোক-মনস্তত্ত্ব দ্বারাও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এটা সন্দেহাতীত যে দুর্খায়েম সমাজতত্ত্বের অন্যতম দিকপাল। কোঁৎ, মার্ক্স, হ্বেবার, প্রমুখ সামাজিক ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীদের সঙ্গেই তাঁর নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে। তিনি ১৮৫৮ সালে ফ্রান্সের এপিনাসে এক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের প্রায় দশ বছর পরে। ফ্রান্সের অসামান্য এই সমাজতাত্ত্বিক সামাজিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি ফ্রান্সের প্রথম অ্যাকাডেমিক সমাজতত্ত্ববিদ কারণ তাঁর আগে সমাজতত্ত্ব বিষয়টি ফ্রান্সের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হতো না। সমাজতত্ত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অর্ন্তভূক্ত না হলেও সমাজতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত অপরাপর বিষয় যেমন শিক্ষা, সামাজিক দর্শন, মনস্তত্ত্ব পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৮৯২ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য দুর্খায়েমকে তাঁর শ্রমবিভাগ তত্ত্বের উপর লিখিত গবেষণাপত্রের জন্য সমাজতত্ত্বে ডক্টরেট প্রদান করে। এর ছয় বছর পর এই অসামান্য পন্ডিত ব্যক্তি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন। সমাজতত্ত্বে শিক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পত্র পত্রিকাতে সমালোচনামূলক পর্যালোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র ও গ্রন্থ প্রকাশ করতে থাকেন।

দুর্খায়েম কতোগুলো বিষয়ে— সামাজিক তত্ত্ব নির্মাণে ও পদ্ধতিগত বিষযে নতুন কথা বলেছেন। তিনি ফরাসী সমাজের বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যিক অবস্থা সর্ম্পকে গভীরভাবে ভাবিত ছিলেন। ১৮৩০, ১৮৪৮, এবং ১৮৭১ সালের বিপ্লবগুলোই 'সামাজিক শৃঙ্খলা' (আসলে তা বুর্জোয়া ব্যবস্থা প্রবর্তিত সামাজিক শৃঙ্খলা) ধ্বংসের কারণ বলে তার প্রতীতি হয়েছিল। কীভাবে মানুষ এক ত্রিত হয়ে সুসংহতভাবে সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে পারে এ বিষয়টা তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছিল। **'সামাজিক পরিবর্তন' অপেক্ষা সামাজিক শৃঙ্খলার ওপর তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বর্তমানে ক্রিয়াশীলতাবাদে যেমন 'ক্রিয়া' বা 'কর্ম' দিয়ে সামাজিক ঘটনা বা বিষয়ের অস্তিত্বের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়, দুর্খায়েম তারও প্রতিষ্ঠাতা। এ ভাবেই তিনি সামাজিক শৃঙ্খলার সমাজতত্ত্ব গড়ে তুলতে চাইলেন।**

প্রকৃতপক্ষে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকটকে অতিক্রম করার এবং নতুনভাবে তার পুনর্গঠিন এবং তাকে ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে মুক্ত করার মানসে দুর্খায়েম, বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য সঠিক বিজ্ঞান নির্ভর মতাদর্শগত অস্ত্র তৈরী করলেন। **দুর্খায়েমের সমাজতত্ত্ব আসলে বুর্জোয়া ব্যবস্থা সংরক্ষণের অন্যতম সমাজতত্ত্ব। কোঁৎ প্রতিষ্ঠিত ইষ্টবাদী *(Positivisim)* সমাজতত্ত্বের ধারাকে অনুসরণ**

করেই তিনি বুর্জোয়া স্বার্থ উপযোগী বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ব' বা সমাজতাত্ত্বিক স্কুল *(Sociological School)* **গড়ে তুললেন। তিনি বুর্জোয়াদের যোগালেন নতুন বিশ্বাস, নতুন মতাদর্শ, 'সমসাময়িককালের প্রয়োজন মেটানোর ধর্ম।'** সামাজিক সমস্যা নিরাকরণের যে সব উপায় ও পথ তিনি দিলেন তা আসলে 'বুর্জোয়া শ্রেণীসংহতির' তত্ত্ব। তিনি আসলে এটা বুঝেছিলেন যে সামাজিকভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে না পারলে, সমাজসংহতি ঠিকভাবে না থাকলে বুর্জোয়া স্বার্থেব বিকাশ হতে পারে না। শ্রম ও পুঁজির বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার যে সামাজিক তত্ত্ব তিনি দিলেন, তা আসলে বুর্জোয়া উদারনৈতিক মতাদর্শ। সামাজিক সংহতির প্রয়োজন বুর্জোয়া স্বার্থের বিকাশের কারণেই। তবে প্রথম দিকে তিনি বুর্জোয়া ব্যবস্থার একনিষ্ঠ সমর্থক হলেও পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রতি সহানুভূতিশীল হন, এবং সেই তত্ত্বের আলোচনা করতে থাকেন, তবে মার্ক্সীয় বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ না করে বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় করা সম্ভব হবে এমনি এক প্রত্যয়জাত সমাজতন্ত্র বা 'সংস্কারমূলক সমাজতন্ত্রের' কথা বললেন। এটা অবশ্যই তাঁর উপরে সাঁ সিমঁ ও অন্যান্য সংস্কারমূলক সমাজতান্ত্রিকদের প্রভাবের ফল।

দুর্খায়েমের সব থেকে বড় কৃতিত্ব হল তিনিই প্রথম সমাজতত্ত্বকে মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন। অগাস্ত কোঁৎ সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ের গবেষণার ক্ষেত্রে জীববিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার সাহায্যে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জীববিদ্যা নিয়মের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের নিয়মের সাদৃশ্য খোঁজাব চেষ্টা করেছিলেন; নিউটনের পদার্থবিদ্যার আলোকে সামাজিক বিষয়ের কার্যকারণ সর্ম্পকের সন্ধান করেছিলেন এবং সামাজিক পদার্থবিদ্যা' *(Social Physics)* গড়ে তুলেছিলেন। হার্বার্ট স্পেনসারের সমাজতত্ত্ব যে জীববিজ্ঞান- নির্ভর তা বলাই বাহুল্য। কাবণ তিনি সামাজিক ইতিহাস ব্যাখায় জীববিজ্ঞানগত বিবর্তন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন যদিও তিনি সমাজ ও জীবদেহের মধ্যে বৈসাদৃশ্য দেখাতে ভোলেন নি। কিন্তু দুর্খায়েম সচেতন সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে সামাজিক বিষয়ের কারণ খুঁজেছেন সামাজিক বিষয়ের মধ্যে। জীববিদ্যা বা মনস্তত্ত্ব দিয়ে তিনি সমাজ বিষয়ের ব্যাখ্যা করেন নি। তাঁর মতে, সামাজিক ঘটনাগুলো হল সামাজিক তথ্য *(Social Facts)*। এগুলোর রয়েছে সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক নির্ধারক শক্তি *(determinants)*। তিনি সামাজিক তথ্য বা ঘটনাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে;

> *every way of acting, fixed or not, capabale of exercising on the individual an external constraint.*

ব্যক্তিনিরপেক্ষ বা ব্যক্তির পূর্ববর্তী হয়ে এই সব ঘটনা বা তথ্য ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এবং সেই অর্থেই সমাজ ব্যক্তিকে অতিক্রম করে এক ধরনের স্থায়িত্ব অর্জনে সক্ষম হয়। ব্যক্তি এক ধরণের প্রতিষ্ঠিত সমাজের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে। প্রথা, আইন, আচরণের সাধারণ নিয়ম মানুষ প্রশ্ন না করেই সাধারণতঃ মেনে নেয়। মেনে চলেও। কখনো কখনো সামাজিক তথ্য বা ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেও এগুলোকে সমাজস্থ ব্যক্তিরা অস্বীকার করতে পারে না। **ব্যক্তি হল সমাজের সৃষ্টি; সমাজের সৃষ্টিকর্তা নয়।**

অন্যভাষায়, সমাজের ব্যক্তি নিরপেক্ষ এক সত্তা আছে। একটা নির্দিষ্ট সমাজ সমগ্রের মধ্যে ব্যাক্তি জন্মগ্রহণ করে; সেই সমাজের এবং সামাজিক নিয়মকানুনের মধ্যে দিয়ে সে বড় হয়। ব্যাক্তি হল সমাজের অংশ। ব্যক্তি ছাড়া সমাজ থাকতে পারে এ কথা দুর্খায়েম বলেন নি; তিনি

বলেছেন সমাজের ব্যক্তি নিরপেক্ষ চরিত্র আছে। দুর্খায়েম মার্কসবাদী নন, কিন্তু মার্কসের চিন্তাভাবনার প্রভাব তাঁর ওপরে পড়ে নি তা নয়। মার্কস মানুষকে বিমূর্তায়ন না করে সামাজিক পটভূমিতে তাকে ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটল *মানুষকে 'সামাজিক জীব ' বলেই অভিহিত করেছেন* এবং সমাজকে প্রাধিকার দিয়েছেন। Theses on *Feuerbach* এ মার্কস লিখেছেন ঃ

'Man is the ensemble of Social relations.'

মানুষ বিমূর্তণ নয়; সে সামাজিক সম্পর্কের যোগফল। দুর্খায়েম একই ভাবে সমাজের প্রাধান্যকে স্বীকার করেছেন; উদারনীতিবাদীদের মত তিনি ব্যাক্তিকে সমাজের 'অণু' বা একক ভাবেন নি, মানুষকে সমাজবিচ্ছিন্ন করে আলোচনা করেন নি। দুর্খায়েম বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর শ্রমবিভাগ তত্ত্ব, শিক্ষা সম্পর্কিত তত্ত্ব, ধর্ম সম্পর্কিত নিয়মাবিষ্কারে, সর্বোপরি তাঁর 'আত্মহনন' সম্পর্কিত গবেষণা কর্মে। একজন সমাজতাত্ত্বিকের পক্ষে এতগুলো বিষয়ে সামাজিক তত্ত্ব নির্মাণ ও ব্যাখ্যা করা কম শ্লাঘার বিষয় নয়। সব থেকে বড় কথা, সমাজতত্ত্বকে তিনি সমাজতত্ত্ব হিসেবে গড়ে তুলেছেন, তাকে স্বাধীন আলোচনা ক্ষেত্র হিসেবে নির্মাণ করেছেন, তাকে বর্ণাঢ্য করে তুলেছেন। কোঁৎ কে যদি সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে 'সকালবেলার সূর্য' বলা যায়, তবে দুর্খায়েমকে নিশ্চিতভাবেই 'মধ্যদিনের সূর্য' বলা যেতে পারে। মার্ক্সকেই মধ্যদিনের সূর্য বলা যেতে পারতো, কিন্তু আমরা তাঁকে তা বলছি না এ কারণেই যে মার্কস প্রকৃতপক্ষে সমাজতাত্ত্বিক ছিলেন না, বরং তিনি কোঁৎ প্রতিষ্ঠিত সমাজতত্ত্বকে এক ধরনের 'সমাজসংরক্ষণ তত্ত্ব' বলেই অভিহিত করেছেন। সমাজতত্ত্ব তা কোঁৎ এর হোক, বা দুর্খায়েমের হোক কিংবা আধুনিককালের ট্যালকট পার্সনস্ বা আর. কে. মার্টনের হোক, কোন না কোন ভাবে তা 'সামাজিক স্থিতাবস্থার' দ্বারা কম বেশী আক্রান্ত। পরিবর্তন প্রয়াসের বাধা হিসেবেই তার খ্যাতি বা অখ্যাতি। আর মার্ক্সের সামাজিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব (সমাজতত্ত্ব নয়) এই স্থিতাবস্থার প্রচন্ড বিরোধী। তাঁর সাম্যবাদী সমাজেব পরিকল্পনার মধ্যেও কোন স্থিরনির্দিষ্ট নীতিমালার কথা নেই। বরং তিনি একথাই বলেছেন যে সাম্যবাদ মানুষের তাৎক্ষনিক ভবিষ্যৎ, শেষ কথা নয়।

দুর্খায়েমের সমাজতাত্ত্বিক রচনা ও প্রবন্ধের সংখ্যা কম নয়। তাঁর রচনাবলীর একটা সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত তুলে ধরলে তাঁব সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করতে আমাদের সুবিধে হবে এবং তাঁর বৌদ্ধিক জীবনের ইতিহাসও উন্মোচিত হবে।

১) *The Division of labour in Society (De La Division de Travail sociale)*: ১৮৯৩ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করার পর তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর গবেষণা কর্মের বিস্তৃত ও বিকশিত রূপ এই গ্রন্থ। **শ্রমবিভাগ বিষয়টি প্রধানত অর্থনীতির অর্ন্তভূক্ত কিন্তু দুর্খায়েম এই গ্রন্থে শ্রমবিভাগকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, সামাজিক বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।** এই গ্রন্থের দুটি অংশ রয়েছে; প্রথম অংশে শ্রমবিভাগের সামাজিক কার্যাবলী ও তার সামাজিক ফলাফল সর্ম্পকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে; দ্বিতীয় অংশে শ্রমবিভাগের প্রকৃতি ও তার বিভিন্ন উপাদানের বর্ণনা করা আছে। এই গ্রন্থে শ্রমবিভাগকে ভিত্তি করে সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।

২) *The Rules of Sociological Methods (Les Regles de la Methode Sociologique)*: এই গ্রন্থটি ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে সমাজতত্ত্বের মৌলিক আলোচ্য বিষয়ের উপস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতত্ত্বের পদ্ধতিগত বিষয়ে কতকগুলো মৌলিক সূত্র

উত্থাপন করা হয়েছে। এখানে সমাজতত্ত্বকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করার বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা কবা হয়েছে। বিষয়গতবাদকে *(objectivism)* সমাজতত্ত্বে কিভাবে প্রয়োগ করা যাবে তাঁব এক পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা এখানে দুর্খায়েম দিয়েছেন। এই গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে **সমাজতত্ত্বের ছাত্র ও গবেষকদের কল্পনা, ব্যক্তিগত সংস্কার, মূল্যবোধ প্রভৃতি বর্জন করে সামাজিক বিষয়ের কার্যকারণ ব্যাখ্যার দিকে মনোযোগী হতে হবে।** সমাজতত্ত্বকে কিভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় তার এক সমালোচনামূলব বিশ্লেষণ রয়েছে এই গ্রন্থে।

৩) *The Suicide (Le Suicide)*: এই গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৯৭। এই গ্রন্থে ব্যক্তির কীভাবে সমাজচ্যুতি ঘটে, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও বিসংগঠন এর ফলে কিভাবে ব্যক্তি আত্মহননের দিকে অগ্রসর হয় তার এক বৈজ্ঞানিক ও মননশীল সামাজিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করা হয়েছে। সামাজিক কি কি কারণ আত্মহননের জন্য দায়ী তাঁর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করে দুর্খায়েম সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে আত্মহনন ব্যক্তিই করে কিন্তু আত্মহননের ব্যাক্তিগত কারণ অপেক্ষা সামাজিক অব্যবস্থা ও অন্যান্য উপাদানই ব্যাক্তির মধ্যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করে এবং আত্মহননে প্রবৃত্ত করে। *'Individuals commit suicide, but the case of it is always social.* দুর্খায়েম আত্মহননের বিষয়কে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন।

৪) *The Elementary Forms of Religious Life (Les Forms Elementaries de le yie Religiouse)*: গ্রন্থটি ১৯১২ সালে প্রকাশিত। এই গ্রন্থের মৌলিক উদ্দেশ্য হ'ল ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করা; এই গ্রন্থে দুর্খায়েম ধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ ও সামাজিক ইতিবাচক ভূমিকা সর্ম্পকে এক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ধর্ম সম্পর্কে আধিদৈবিক, প্রকৃতিবাদ, সর্বপ্রাণবাদ প্রভৃতি তত্ত্বের সমালোচনা করে ধর্মের সামাজিক উৎপত্তি ও সমাজসংরক্ষণে ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে দুর্খায়েম এক যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে তিনি ক্রিয়াশীলতা তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ করেছেন।

এই সব প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলো ছাড়াও তাঁর রয়েছে আরো কয়েকটি অপ্রধান গ্রন্থ ও নানা সামাজিক বিষয়ে প্রবন্ধ। এদের মধ্যে সব থেকে উল্লেখ্যযোগ্য হল ক) *Sociology of Education;* খ) *Sociology of Philosophy* গ) *Moral Education*। এই সব গ্রন্থগুলোতে তিনি শিক্ষা,দর্শন ও নৈতিকতা সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে তাদের সামাজিক প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন।

দুর্খায়েম তাঁর রচনাবলীর মধ্যে দিয়ে কোঁৎ প্রতিষ্ঠিত সমাজতাত্ত্বিক নির্মাণ কার্যকে আরোও অগ্রসর করে তাকে সম্পূর্ণ এক অট্টালিকার রূপ দিয়েছেন। এই সব রচনাবলীর মধ্য দিয়ে একদিকে তিনি যেমন *Macro* আলোচনা করেছেন, তেমনি সামাজিক বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা তথ্য সম্পর্কে *Micro* আলোচনা করেছেন। তবে প্রতিটিক্ষেত্রেই তিনি 'সমাজসমগ্রের' আলোকেই সামাজিক বিষয়কে আলোচনা করেছেন। শ্রমবিভাগতত্ত্ব, যান্ত্রিক ও অর্ন্তজাত বা জৈব সংহতি সম্পর্কে সামাজিকতত্ত্ব, সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি, সমাজিক তথ্য বা ঘটনা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় অবদান। আত্মহননের তত্ত্ব সমাজতত্ত্বে এক অসামান্য সাধন সাফল্য। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যাও নতুনত্বের দাবি করতে পারে।

সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি ও সামাজিক তথ্য

> সচরাচর লোকে মাকড়সার জালের সহিত আমাদের জীবনের তুলনা দিয়া থাকে। কথাটা পুরানো হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহা যে কতটা সত্য তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বন্ধনই আমাদের বাসস্থান। বন্ধন না থাকিলে আমরা নিরাশ্রয়। সে বন্ধন আমরা নিজের ভিতর হইতে রচনা করি। বন্ধন রচনা করা এমনি স্বাভাবিক যে, একবার জাল ছিঁড়িয়া গেলে দেখিতে দেখিতে আবার শত শত বন্ধন বিস্তার করি, জাল যে ছেড়ে এ কথা একেবারে ভুলিয়া যাই।... সেখানকার গাছে, ভূমিতে আকাশে সেখানকার চন্দ্র সূর্য তারায়, সেখানকার মানুষে, সেখানকার রাস্তায়, ঘাটে, সেখানকার আচারে ব্যবহারে, সেখানকার ইতিহাসে, আমাদের জালের শত শত সূত্র লগ্ন করিয়া দিই, মাঝখানে মস্ত হইয়া বিরাজ করি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দুর্খায়েম ইষ্টবাদী ধারণার বিকাশ করেছেন এবং তাকে অতিক্রম করেছেন। সমাজতত্ত্বকে তাত্ত্বিকভাবে ও পদ্ধতিগতভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পদ্ধতিগত নীতি সমূহের সমন্বয় করতে চেয়েছেন। যে কোন সামাজিক বিষয়ের তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পদক্ষেপ হিসেবে পদ্ধতি নির্মাণ করতে হয়। সামাজিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের পূর্বেই জ্ঞান অজর্নের পদ্ধতির অনুসন্ধান করতে হয়। জার্মান দার্শনিক হেগেল মানব ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দ্বন্দ্বতত্ত্বে তাঁর পদ্ধতি করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে দ্বন্দ্বতত্ত্বের মাধ্যমেই তিনি মানবিক চিন্তাভাবনার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে যর্থাথ ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে মানব ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারবেন। তিনিই প্রথম সামাজিক বিকাশের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বাদ, প্রতিবাদ এবং সম্বাদ এই ত্রয়ীর সাহায্যে তিনি মানব ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বিকাশের ছবি দিয়েছেন। কার্ল মার্কসও দ্বন্দ্বতত্ত্বের হেগেলীয় ভাববাদী ও অতীরিন্দ্রিয় অংশ বর্জন করে পদ্ধতিগত 'যুক্তিবাদী শাঁস' গ্রহণ করে সামাজিক ইতিহাসের পরিবতনের ব্যাখ্যায় সার্থক প্রয়োগ করেছেন। দুর্খায়েম হেগেল বা মার্ক্সের পথে হাঁটেন নি। তিনি কোঁৎ প্রতিষ্ঠিত ইষ্টবাদী ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার পদ্ধতি নির্বাচন করেছেন। কিন্তু পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র অনুকারক ছিলেন না; তিনি সব সময়ে কোঁৎ কে অনুসরণ করেন নি; তিনি কোঁৎ প্রতিষ্ঠিত ইষ্টবাদের সমালোচনা করেছেন, এবং তার বিকাশ সাধন করেছেন এবং কোঁৎ কে অতিক্রম করে তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

দুর্খায়েম কোঁৎ এর মতই বিশ্বাস করতেন যে সামাজিক ঘটনার বিশ্লেষণ করতে গেলে বিজ্ঞান নির্ভরতা আনতে হবে এবং যথার্থ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। ইষ্টবাদী

পদ্ধতিগত বিষয়ের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং সেই তথ্যগুলোর মধ্যে সম্পর্ক নির্মাণ করা। দুর্খায়েম ইষ্টবাদীদের অনুসৃত প্রকৃতিবাদী নীতির সমর্থক ছিলেন; প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করতে গিয়ে তিনি আরোহ পদ্ধতি ও বিষয়নিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সমসাময়িকদের, বিশেষ করে লা বঁ ও টাডের 'মনস্তত্ত্ববাদ' পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি। ***তাঁর মতে, সামাজিক ঘটনাকে সামাজিকভাবেই ব্যাখ্যা করতে হবে।***

দুর্খায়েম তাঁর *The Rules of Sociolgical Method* গ্রন্থে বলেন যে বিষয় নিষ্ঠতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করার অর্থই হ'ল সামাজিক ঘটনা বা বাস্তবতাকে জিনিস বা 'বস্তু' হিসেবে দেখা। তিনি লিখেছেন :

> *The first and most fundamental rule is . Consider social facts as things*

সামাজিক প্রপঞ্চকে বা তথ্যকে বস্তু হিসেবে মনে করার অর্থ হল এটা স্বীকার করে নেয়া যে এগুলো বিষয়ী-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল এবং এইসব ঘটনাকে বিষয়নিষ্ঠতার সঙ্গে প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিষয়সমূহের মত ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

এই পদ্ধতিগত বিষয়গতবাদ সামাজিক বিশ্লেষণে প্রয়োগ করতে গিয়ে দুর্খায়েম অনেকগুলো জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন এবং তার উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। যেমন সামাজিক সচেতনতার *(Social Consciousness)* বিষয়গুলো কী সরাসরিভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? তিনি এর উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন ব্যাক্তির বিভিন্ন ধরনের আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত বিষয়গত ও সমষ্টিগত চেতনার সামাজিক বিভিন্ন রূপের মধ্যে দিয়ে তা ব্যাখ্যা করতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তির আচরণ সমষ্টিগত সামাজিক চেতনারই ফল হিসেবে দেখতে হবে। সমষ্টিগত চেতনার বিষয়গতকরণের *(objectivization)* বিষয়টি সমাজতত্ত্বের অন্যতম আলোচ্য বিষয় এবং একে সামাজিক তথ্য *(Social facts)* হিসেবেই দেখতে হবে। যেমন দুর্খায়েম মনে করেন যে, সংখ্যাতত্ত্বের মাধ্যমে মানুষের সামাজিক প্রাত্যহিক জীবনের ঝোঁক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে কিংবা আদিম মানুষের বিভিন্ন প্রথা ও নিয়মকানুনের এবং আচারব্যবস্থার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে কিংবা বিশ্বসাহিত্যের শিল্পকর্মগুলোর মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিকভাবে শিল্পরূপের ও শিল্পসম্পর্কীয় ধারণার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

ভৌতবিজ্ঞানগুলোর ক্ষেত্রে অনেক সময় পরোক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়, তেমনিভাবে, সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। পর্যবেক্ষণ-শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণের জন্যই নয়; পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনা বা সামাজিক তথ্যের পারস্পারিক সম্পর্ক কার্য কারণের সম্পর্ক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় ও সামান্যীকরণ করা যায়। এভাবেই সামাজিক মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণকারী বিশ্বাস কাঠামো, প্রথা, সামাজিক অনুষ্ঠান, আচারব্যবস্থা সংক্ষেপে সামাজিক ব্যবস্থার তথ্য বা ঘটনা প্রাকৃতিক বস্তু ও প্রপঞ্চের মত 'বস্তু' হিসেবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।সামাজিক তথ্যগুলোকে প্রতক্ষ্যভাবেই পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং বিষয়গতভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে। সামাজিক ঘটনাগুলো মানুষের চেতনার মধ্যে দিয়েও প্রকাশিত হয়, যেমন সামাজিক বিশ্বাসকাঠামো তার সদস্যের জীবন দৃষ্টিকোণের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয় কিন্তু সামাজিক তথ্যগুলি ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবেই অস্তিত্বশীল থাকে এবং ব্যক্তির উপর অনিবার্যভাবে

প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ দুর্খায়েম কার্ল মার্ক্সের মতই 'বস্তুর' *(facts)* স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী, যদিও মার্ক্সের সামাজিক বিশ্বের আলোচনায় যে সামগ্রিগতার, সমাজ সমগ্রের চিত্র পাওয়া যায় দুর্খায়েমের সমাজতত্ত্বে তা পাওয়া যায় না। "মানুষ ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, কতগুলি সামাজিক সর্ম্পকের মধ্যে আসে যে সম্পর্কগুলো মানবনিরপেক্ষভাবে অবস্থান করে।" *The Critique of Political Economy* তে মার্ক্স লিখিত এই ব্যাখ্যাটি আমাদের অনেকেরই জানা। ***দুর্খায়েম বলেন সামাজিক তথ্যের স্বাধীন অস্তিত্বই প্রমাণ করে সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিব বা বিজ্ঞাননির্ভর চরিত্র।*** দুর্খায়েম তাঁর সমাজবিশ্লেষণের পদ্ধতির ক্ষেত্রে তথ্য বা ঘটনার সঙ্গে নিয়মকানুনের অপরিহার্য পারস্পরিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। তথ্যগুলো নিয়মকানুগুলোর বাহ্যিক প্রকাশ আর নিয়মকানুনগুলো হল তথ্যগুলোর সাধারণ আভ্যন্তরীণ ভিত্তি। দুর্খায়েম আরো বিশ্বাস করেন যে কতকগুলো সংবেদনাত্মক অস্পষ্ট ধারণাকে ভিত্তি করে আলোচনা শুরু করলে তা বস্তুর প্রকৃত চিত্র ও চরিত্র উপস্থিত করতে পারে না; তাই তিনি অস্পষ্ট ধারণা, আবেগ, কুসংস্কার, গবেষকের নিজস্ব চিন্তাভাবনা দূর করে সমাজ গবেষণায় হাত দিতে বলেন।

দুর্খায়েম তাঁর সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে তথ্যকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীল বিষয় হিসেবে দেখলেও একথা স্বীকার করেন নি যে সমাজ ব্যাক্তি ছাড়া অস্তিত্বশীল: ব্যাক্তি ছাড়া সমাজের ধারণা এক অবাস্তব কল্পনা। সামাজিক তথ্য বা সমাজের স্বাতন্ত্র্য বলতে দুর্খায়েম শুধু এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে বাস্তব সামাজিক ঘটনার 'বিষয়গততা' *(objectivity)* বা বিষয়নিষ্ঠতা আছে। তথ্যের স্বাধীন সত্তা বা অস্তিত্ব আছে একথা বলার অর্থ এটা নয় যে সামাজিক বিষয় বা ঘটনার মধ্যে অতিপ্রাকৃতিক বা অতিমানবিক রহস্যময়তা আছে। সমাজের মধ্যে স্বতন্ত্র এক আত্মা বা মন আবিষ্কার করাও তাঁর লক্ষ্য ছিল না। গোষ্ঠী মনের কথা বললেও তাকে তিনি ব্যক্তি মন থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন করেন নি। আসলে তিনি চেয়েছিলেন ব্যাক্তি ও সমাজের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে; *এটা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে **এটা হল সমগ্র ও অংশের সম্পর্ক, যেমন রাসায়নিক সম্পর্কের ধারণায় হয়ে থাকে। সমগ্রের হাতে তিনি অংশকে ছেড়ে দেন নি।** এক্ষেত্রে দুর্খায়েম এর সঙ্গে মার্ক্সের কোন পার্থক্য নেই বললেই চলে।*

দুর্খায়েম কোঁৎ ও স্পেনসারের পদ্ধতিগত কাঠামোকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, এঁরা দুজনেই সামাজিক তথ্যগুলোর বৈজ্ঞানিক ও বিষয়গত আলোচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা 'বস্তুকেন্দ্রিক' ব্যাখ্যা না করে ধারণাকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন; ফলে সামাজিক তথ্যগুলির প্রকৃত ও বাস্তবসমৃদ্ধ ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারেন নি। দুর্খায়েম তথ্যকেন্দ্রিক আলোচনার পক্ষপাতী। ***তাঁর পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও উপাদানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। Barnes দুর্খায়েমের বিষয়গতবাদ বা ইষ্টবাদী পদ্ধতির প্রশংসা করে লিখেছেন ঃ***

> *As a social scientist of the positivist personnel he could not fail to support the position that science could provide a new and quite adequate basis of social organization.*

দুর্খায়েমের পদ্ধতিগত চিন্তাভাবনার সংক্ষিপ্ত সূত্রায়ণ করলে নিম্নলিখতি বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যায়:

ক) বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ব নির্মাণ : সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোঁৎ এর অবদানকে অস্বীকার করা যায় না; কোঁৎ ই বিজ্ঞান নির্ভর সমাজতত্ত্ব গঠনের ভিত্তি

প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন দুর্খায়েম তাকে আরোও বিকশিত ও সুসম্পন্ন করেছেন। তিনি তাঁর পূর্বসুরীর মতই মনে করতেন যে সমাজতত্ত্বের আলোচনা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ওপর নিশ্চিত নির্ভরশীল। সমাজবিজ্ঞানী কোন সামাজিক ঘটনা বা তথ্য আলোচনার ক্ষেত্রে আবেগ, নিজস্ব বিশ্বাস,পছন্দ অপছন্দ এবং অন্যান্য বিষয়ীগত উপাদান বর্জন করবেন। দুর্খায়েমের এই প্রত্যয় দ্বারা প্রভাবিত হয়েই জার্মান সমাজতত্ত্বের মহাপন্ডিত ম্যাক্স হেবার তাঁর সমাজতত্ত্বকে 'মূল্যমান নিরপেক্ষ' ভাবে নির্মাণ করেছিলেন। তবে একথা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার যে দুর্খায়েম নৈতিকমানকে একেবারে উপেক্ষা করেন নি। কারণ সমাজের শিকড়েই থাকে মূল্যমান সংক্রান্ত প্রশ্ন। তবে দুর্খায়েমের বক্তব্য হ'ল নৈতিক মূল্যগুলোকেও সামাজিক তথ্য হিসেবেই দেখতে হবে। Bogardas তাঁর Development of Social Thought গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

> *In his dicussion of methods, Durkheim urges that all considerations of sentiments be avoided, that the personal equation be kept out of picture, that objects of study be carefully defined in advance, and that the normal data or data as they are distinguished from those that ought to be He puts special emphasis on the method of Concomitant variations, pure correlation is not enough for concomitant variation may not necessarily be causal. Concomitant variations must show logical as well as statistical reasons for the relationships before causal connection can be assumed.*

খ) বিষয়বাদিতা : আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে দুর্খায়েম ব্যাক্তিগত ধারণা থেকে সমাজতত্ত্বকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন; সমাজতত্ত্বকে তিনি তথ্যমূলক 'বিষয়গত' বিষয়ে রূপান্তরিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সামাজিক তথ্য ও ঘটনাসমূহ গতিশীল, একজায়গায় স্থির হিসেবে থাকে না, তা বদ্ধ জলাশয় নয়, চ্ছল চ্ছল নদীর মত বহতা। তাই সামাজিক তথ্যগুলিকে তার গতিশীলতা বা বিকাশের মধ্যেই সংগ্রহ করতে হবে এবং তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেও 'বিষয়গততা' বা বিষয়বাদিতার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। অন্য ভাষায়, তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যুক্তি ও যুক্তিগ্রাহ্যতার ওপর নির্ভর করতে হবে।

গ) সামাজিক তথ্যের তাৎপর্য : দুর্খায়েমের পদ্ধতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সামাজিক তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। আবেগ, চিন্তা কল্পনা প্রভৃতি সমাজতত্ত্বের প্রকৃত বিষয় নয়; ব্যাক্তিগত মূল্যবোধ ও উপাদানের উপর নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ব সৃষ্টি করা যায় না। ***ব্যাক্তি নয়, গোষ্ঠী বা সমাজ, ব্যাক্তিগত চিন্তাভাবনা নয়, তথ্যগুলোই সমাজতত্ত্বের মৌলিক আলোচনার একক।*** তিনি তাঁর Rules of Sociological Methods তে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন ঃ

> *If we then begin with the individual, we shall be able to understand nothing on what take place in a group. In a word, there is between sociological and sociology the same*

break in continuty as between biology and physio-chemical science consequently, every time though a social phenomenon is directly explained by sociological phenomenon, we may be sure that explanation false.

ঘ) সামাজিক তথ্যগুলি আলোচনার মান : দুর্খায়েমের মতে, সামাজিক তথ্য বা ঘটনা বিশ্লেষণে ব্যাক্তি মূল্যহীন; সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক ঘটনাই বিশ্লেষণ করতে হবে। সামাজিক ঘটনা বা তথ্যকে যে যে কারণগুলো নির্ধারণ ও প্রভাবিত করে তারই আলোচনা করতে হবে। এই আলোচনা করতে গিয়ে দুর্খায়েম দুইটি সামাজিক মানের *(standards)* উল্লেখ করেছেন। এগুলো হল বাধ্যতা এবং বাহ্যিকতা।

১) বাধ্যতা *(constraint)* : বাধ্যতা বলতে বোঝায় যে সামাজিক তথ্যগুলো ব্যক্তিকে উপেক্ষা করতে পারে এবং ব্যক্তির উপর কতকগুলো সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে পারে। এবং করেও। সামাজিক তথ্যগুলো ব্যক্তি তৈরী করে না, সেগুলো মানুষের চেতনা নিরপেক্ষভাবেই অথবা চেতনার বাইরে অবস্থান করে। দুর্খায়েম বলেন ঃ

Collective ways of acting or thinking have a reality outside the individuals.

মার্ক্সের *Critique of Political Economy* গ্রন্থের *"It is not the consiousness that determines social being ;on the contray it is the social being that determines the consciousness.* বাক্যটির সঙ্গে দুর্খায়েম থেকে উদ্ধৃত বাক্যটির সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। দুর্খায়েম যাকে সামাজিক তথ্য বলেছেন, মার্ক্স তাকেই বলেছেন সামাজিক সত্তা। সামাজিক তথ্যগুলো ব্যাক্তির ইচ্ছা, চেতনা বা আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং সামাজিক তথ্যগুলোই ব্যাক্তির ইচ্ছা, চেতনা ও চিন্তাভাবনা, আদব কায়দা, আচার আচরণের ওপর স্থায়ী ও কখনো কখনো নিয়ন্ত্রণমূলক প্রভাব ফেলে।

২) বাহ্যিকতা *(Exleriority)* বাহ্যিকতাকে ভিত্তি করেই দুর্খায়েম তার *Agelic Realism* এর তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। তিনি বলেছেন যে সমাজ ব্যক্তির থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পন্ন, তার রয়েছে ব্যক্তি নিরপেক্ষ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। এই বাহ্যিক বাস্তবতা *(external reality)* কোন একজন ব্যক্তির ব্যক্তিচিন্তার ফল নয়, বহু মানুষের চিন্তা ও আন্তঃপ্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এটা গড়ে ওঠে। ব্যক্তির থেকে পৃথক অস্তিত্ব সম্পন্ন হয়েও এগুলো ব্যাক্তির ওপর কতকগুলো বাধা ও বাধকতার সৃষ্টি করে।

সহজ কথায়, সামাজিক তথ্যগুলোকে বস্তু হিসেবে দেখতে হবে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি ব্যবহার করেই আলোচনা করতে হবে। অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই সামাজিক ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে পরিণত হতে পারে। আর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পথেই সমাজতত্ত্বকে প্রকৃত বিজ্ঞানের মর্যাদায় উন্নীত করা যেতে পারে। এইসব কারণেই দুর্খায়েম সামাজিক তথ্য ও তাদের আভ্যন্তরীণ পার্থক্য ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সংখ্যাতত্ত্বকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। ট্যালকট পার্সনস সঙ্গত কারণেই বলেছেন:

Durkheim was a scientific theorist in the best sense of one who has never theorised in the air, never indulged in

the speculation but was always seeking the solution of crucially important empirical problem.

ঙ) যৌথ চেতনা : দুর্খায়েমের বিশ্লেষণ ধারার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল 'যৌথচেতনা' *(Conscience Collective)*। তাঁর মতে, সামাজিক তথ্য সমূহ ব্যক্তির কার্যকলাপের ফল নয়, সেগুলো 'গোষ্ঠীমন' বা গোষ্ঠী চেতনার ফল। তিনি এই গোষ্ঠী চেতনার ভিত্তিতেই সামাজিক তথ্য ও ঘটনাসমূহের আলোচনা করেছেন। ব্যক্তির মানসিক চেতনার থেকে গোষ্ঠী চেতনা অনেক ওপরে অবস্থান করে। সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই সামাজিক প্রক্রিয়ার উৎস খুজঁতে হবে বলে তাঁর অভিমত। তাঁর লেখাতে ঃ

The ultimate origin of all social processess of any importance must be sought in the situation of the internal social millieu.

চ) *কার্যকারণ সম্পর্ক* : দুর্খায়েম সামাজিক তথ্যগুলোকে বস্তু বা জিনিস হিসেবে আলোচনা করেছেন এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের পদ্ধতি ব্যবহার করে কার্যকারণের ভিত্তিতে সামাজিক তথ্যকে পূর্ববর্তী সামাজিক তথ্যলোর মধ্যে কোন একটিকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায় ঃ

The determining cause of a social factor must be sought from among the antecedent social facts.

ছ) *সহগামী পরিবর্তন* : দুর্খায়েম হেগেল বা মার্ক্সের ঐতিহাসিক পদ্ধতি বর্জন করেছেন। তিনি সামাজিক বিষয়সমূহকে সহগামী পরিবর্তনের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। সহগামী পরিবর্তনের ধারণা আসলে তুলনামূলক পদ্ধতিরই রকমফের। তাঁর মতে, বিভিন্ন সামাজিব ঘটনাসমূহ বিভিন্ন সামাজিক তথ্যের তুলনামূলক আলোচনা করে ব্যাখ্যা করতে হবে। কখনো কখনো এক সামাজিক ঘটনা অপর সামাজিক ঘটনার ফল হিসেবেও দেখতে হবে। এভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা বৈজ্ঞানিক ও পরিকল্পনামাফিক হতে পারবে।

জ) *ফলিত সমাজতত্ত্ব* : দুর্খাযয়েম সমাজতত্ত্বকে শুধু জ্ঞান আহরণের বিদ্যা হিসেবেই দেখেন নি, যদিও বিজ্ঞানের মৌলিক উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ করা। সমাজতত্ত্ব , তাঁর মতে তাত্ত্বিক ও ফলিত দুইই। তত্ত্বগত বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব সামাজিক জীবনব্যাখ্যায় তিনি সমাজতত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন। সেদিক থেকে সমাজতত্ত্ব যেমন সামাজিক বিষয়সমূহের জ্ঞান দেয়, তেমনি সামাজিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও পরিবর্তনের পথনির্দেশ করে। সমাজতত্ত্ব আসলে মানুষের সামাজিক জীবনের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। সমাজজীবনের ক্ষেত্রে সেই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাস্তবে প্রয়োগ। দুর্খায়েম তাঁর প্রতিটি গ্রন্থেই তত্ত্ব ও বাস্তবের মধ্যে সমন্বয় করেছেন। সামাজিক শ্রমবিভাগ, আত্মহনন, বিবাহ, শিক্ষা, নৈতিকতা, ধর্ম প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ে তার আলোচনা তাত্ত্বিক সীমা অতিক্রম করে ফলিত সমাজতত্ত্বের এলাকাকে স্পর্শ করেছে। দুর্খায়েমের অন্যতম সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয় হল সমাজসংহতির ধারণা কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি শুধু সামাজিক সংহতির সংজ্ঞা নিরূপণ করেই ক্ষান্ত হন নি, সামাজিক সংহতির বাস্তব সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দিকটি উল্লেখ করে বলেছেন যে সমাজসংহতি ব্যাক্তি ও সমাজ উভয়ের পক্ষেই অপরিহার্য। সামাজিক সংরক্ষণের ব্যাপারে, কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর মনোযোগ দেয়া দরকার

তারও উল্লেখ করেছেন। তাঁর ঘোষণা ঃ

We should not consider our scientific labour and our trouble if they were to have only a speculative interest.

দুর্খায়েম সমাজতত্ত্বকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন ; সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞান হিসেবে নির্মাণ করতে গেলে পদ্ধতিগত দিক থেকেও তা করতে হবে। পদ্ধতিগত রূপ ও কলাকৌশল ব্যবহার সামাজিক বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান নির্ভরতা এনে দেয়, বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিতি দেয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যেভাবে পদ্ধতিগত আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তা করা আবশ্যক। বিষয়বাদিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে দুর্খায়েম নিশ্চিতই সমাজতত্ত্বে এক অসামান্য বিপ্লবাত্মক কাজ করেছেন। কিন্তু দুর্খায়েমের পদ্ধতির ক্ষেত্রে নানা ধরনের ত্রুটি এবং বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়।

দুর্খায়েম ব্যবহৃত 'বস্তু' বা ঘটনা প্রত্যয়গুলোর বিভিন্ন অর্থ আছে এবং সেকারণেই নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। 'বস্তু' এই অভিধার কোন নির্দিষ্টি সংজ্ঞা দেন নি। কোথাও এর ব্যাখ্যাও তিনি করেন নি।

দ্বিতীয়ত, দুর্খায়েমের পদ্ধতিগত বিষয়ে পরস্পর বিরোধী চিন্তা ভাবনার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। তার পদ্ধতিগত অনুমানগুলো 'এক বিস্ময়কর তাত্ত্বিক সংমিশ্রণ'। তিনি কার্যকারণ সম্পর্ক দিয়ে সামাজিক তথ্যগুলোকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। কিন্তু সামাজিক তথ্য বা ঘটনাকে কী সব সময়ে কার্যকারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? একটি সামাজিক তথ্য সব সময়ে অপর সামাজিক তথ্যের ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সামাজিক তথ্যগুলির স্বাধীন অস্তিত্ব আছে একথা বলার অর্থ একটি আর একটির উৎস বা কারণ তা নাও হতে পারে। আর সব থেকে বড় কথা, সামাজিক জীবন ঠিক প্রাকৃতিক বা 'বস্তুসদৃশ' নয়; তার রয়েছে নানা ধরনের বৈচিত্রময় দিক, একই বিষয় কখনও কারণ, কখন কার্য হিসেবে থাকতে পারে। সেই অর্থে সামাজিক জীবনকে কোন ধরনের নির্ধারণ তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। বরং সামাজিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বা আন্তঃপ্রক্রিয়া করে। তাছাড়া কোন বিষয়কে 'বস্তু' হিসেবে দেখলে তার গতিময়তাকে ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। 'প্রাকৃতিক বস্তু' আর সামাজিক বস্তু এক নয়। পদার্থবিদ্যায় আলোচিত বস্তুর সঙ্গে 'সামাজিক জীবনের বস্তু'র দুস্তর পার্থক্য আছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, 'সামাজিক জীবনের' কর্ম প্রবাহে মানুষ অংশগ্রহণ করে, যে মানুষের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি, আবেগ এবং চেতনা আছে। প্রাকৃতিক বস্তুর তা নেই। সমাজজীবনকে নির্ধারণ তত্ত্বের/কার্যকারণ তত্ত্বের থেকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিই সঠিকভাবে এবং বিষয়নিষ্ঠতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে পারে।

দুর্খায়েম কখনো কখনো প্রচলিত মূল্যবোধ, নৈতিকতা, ঐতিহ্য ও বিভিন্ন ধরনের প্রথার গুরুত্বের কথা বলেছেন আবার সামাজিক তথ্য আলোচনার সময় ঐতিহ্যগত বিশ্বাস, মূল্যবোধ বর্জন করতে বলেছেন। দুর্খায়েম এর পদ্ধতিগত অনুমানগুলো পরস্পরবিরোধী ও পরস্পরকে খন্ডন করছে। তাছাড়া ইতিহাসগত দিক থেকে দুর্খায়েম সামনের দিকে না হেঁটে পিছনের দিকে হেঁটেছেন। প্রচলিত বুর্জোয়া ব্যবস্থার সংস্কারের কথা বলেও তিনি পরিবর্তন থেকে স্থিতাবস্থার প্রতিই তাঁর সমর্থন যুগিয়ে গেছেন। আসলে বুর্জোয়া ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আভ্যন্তরীণ সংকটের প্রতিচ্ছবি দুর্খায়েম রচনাবলী ও তাঁর পদ্ধতিগত কলাকৌশলের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের পর এবার আমরা তাঁর সামাজিক তথ্য সম্পর্কে গভীর আলোচনার দিকে অগ্রসর হতে পারি। আসলে তাঁর পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের কেন্দ্রেই রয়েছে সামাজিক তথ্য ও ঘটনার ধারণা। সামাজিক তথ্যের বিশ্লেষণের সময় সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির যুক্তিবিন্যাসের কিছুটা পুনরাবৃত্তি অবশ্যই করতে হতে পারে।

বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বের ধ্রুপদী ইষ্টবাদী পরিকল্পের ভাঙ্গন ও গভীর সংকট সম্পর্কে সবথেকে কড়া বিবৃতি দিয়েছেন দুর্খায়েম, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি সামাজিক তথ্যের ও দৃশ্যমান সামাজিক ঘটনার বিবেচনা করে **সমাজবিদ্যার পদ্ধতি** গ্রন্থে ঘোষণা করেছিলেন যে এই সামাজিক তথ্য বা ঘটনাগুলোকে কখনই জীববিদ্যা বা মনোবিদ্যায় পর্যবসিত করা যায় না বা জীববিদ্যা বা মনোবিদ্যার সাহায্য নিয়ে এগুলোর ব্যাখ্যাও করা যায় না। তিনি বলেন যে যে সামাজিক তথ্যগুলো ধারণা ও ক্রিয়াকান্ডের/কর্মপ্রবাহের মিশ্রণ। এভাবেই তিনি কোঁৎ উত্থাপিত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছিলেন। **তিনি বললেন, ব্যক্তি নয় গোষ্ঠী, যৌথ জীবনই নিম্নতম একক। সমাজতত্ত্বকে যে বিষয়ের বিবেচনা করতে হবে সেটা হ'ল মানুষের সামাজিক বন্ধন ও তাদের পরস্পরের সম্পর্ক।**

সমাজতত্ত্বকে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে দুর্খায়েম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করলেন যে প্রতিটি বিজ্ঞানই বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, যেমন পদার্থবিদ্যার মূল বিষয় হ'ল পদার্থ বা বস্তু *(matter)* এবং তার ধর্ম *(Properties)*, অর্থনীতিতে উৎপাদন, বিনিময় ও বন্টনব্যবস্থা (প্রকৃত প্রস্তাবে উৎপাদন কারণ উৎপাদন না হলে অন্যদুটি মূল্যহীন)। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রই হ'ল কেন্দ্রীয় বিষয়। এই সব কেন্দ্রীয় বিষয়কে ধরে নিয়েই তাত্ত্বিক, মতাদর্শগত কিংবা প্রায়োগিক অনুসন্ধান চালানো হয়ে থাকে। ***সমাজতত্ত্বকে দুর্খায়েম সমাজবাস্তবতার (Social reality) বিজ্ঞান হিসেবে বর্ণনা করলেন। সমাজবাস্তবতার উপাদানগুলোই হ'ল সামাজিক ঘটনা বা তথ্য যেগুলো সামগ্রিকভাবে সমাজ গঠন করে। এই সামাজিক তথ্যগুলোই সমাজতত্ত্বের মৌলিক কেন্দ্রীয় বিষয়। সমাজতত্ত্ব ছাড়া অপর কোন সামাজিক বিজ্ঞান সামাজিক তথ্য বা ঘটনা আলোচনায় হাত দেয় না।***

দুর্খায়েম সামাজিক তথ্য বা ঘটনা আলোচনার ক্ষেত্রে কোনরকমের অর্থনৈতিক বা মনস্তাত্ত্বিক নির্দেশ্যবাদকে মেনে নেন নি। তাঁর মতে, *'Social facts are sui generis,class by themselves'* যে কোন সামাজিক ঘটনারই রয়েছে একধরনের যৌথতা বা 'সমষ্টিগততা'; সামাজিক তথ্য হ'ল যৌথভাবে কাজ করা, চিন্তা করা ও অনুভব করার পদ্ধতি।

মার্ক্সের বিপরীতে তিনি বলেন যে, সামাজিক তথ্য বা ঘটনা অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রকাশ বা প্রতিফলন নয়, এবং সেকারণেই এগুলোকে ঠিক গ্রাফ বা টেবলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যাবে না। আবার সামাজিক ঘটনাগুলিকে ব্যক্তির 'ব্যক্তিতা' দিয়েও বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে সমাজতত্ত্বের বিষয়গুলোকে বৈজ্ঞানিক বিষয়নিষ্ঠতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করার অর্থ সবসময়ে সামান্যীকরণ করতে হবে, তা নয়, কারণ তা সব সময়ে করাও যায় না। সামাজিক বাস্তবতাকে বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের মাধ্যমে। ***এখানে সব থেকে জরুরী হল বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা। নিরাসক্তভাবে, পক্ষপাতশূন্য হয়ে ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করতে হবে।*** সামাজিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে বিষযটা বুঝতে হবে তা হল, সমাজের স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিনিরপেক্ষ চরিত্র আছে, অস্তিত্ব

আছে, তাই এর ব্যাখ্যা হবে বিষয়নিষ্ঠ। আমরা পদ্ধতি আলোচনার সময়ে উল্লেখ করেছি যে সামাজিক ঘটনা দুর্খায়েমের কাছে,'বস্তু'। সামাজিক ঘটনা ভৌতিক বিষয়ের *(physical objects or matter)* মতই সত্য, মানুষ নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল। যদিও ভৌতিক বস্তুর মত সামাজিক তথ্যগুলো সবসময়ে দৃশ্য নয়, যেমন সামাজিক সংহতির ধারণা। সামাজিক তথ্যেব চারটি বৈশিষ্ট্য আছে ঃ

ক) সামাজিক ঘটনার নির্দিষ্ট সামাজিক বৈশিষ্ট্য আছে যা জৈব, অর্থনৈতিক বা মনস্তাত্বিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

খ) সামাজিক ঘটনার ব্যক্তিনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে।

গ) সামাজিক ঘটনাগুলো সময়াতীতভাবে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে টিকে আছে এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জীবনাচরণকে প্রভাবিত করে চলেছে।

ঘ) সামাজিক ঘটনার মান্যকরণের শক্তি আছে।

দুর্খায়েমের ভাষায়, সামাজিক ঘটনা বা তথ্যের ভৌতিক জগতের বিষয়বস্তুর মত একটা বাহ্যিকতা *(exterionty)* আছে; প্রত্যেক ব্যক্তি একটা নির্দিষ্টভাবে পাওয়া সমাজেব মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, বসবাস করে, যা আগে থেকেই সংগঠিত হয়ে আছে। সেই সমাজই ব্যক্তিত্ব বিকাশের জীবনধারাগত ও সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় কর্মপ্রবাহ ঠিক করে দেয়। মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে কোন কাজ করতে পারে না। সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে; ব্যক্তি সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, বর্ধিত হয়, তার অপচয় হয়, সে চলে যায়, কিন্তু সামাজিক তথ্যগুলো কোন না কোন ভাবে পরিবর্তনের পর্ব ও রূপান্তর পার হয়েও টিকে থাকে। ব্যক্তি তাকে কখনই অস্বীকার করতে পারে না। কবি টেনিসন- এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যেতে পাবে:

> ***Man may come and man may go***
> ***But I may go on for ever.***

সামাজিক তথ্য বা ঘটনাগুলো তাই চলতে থাকে, শেষ হয়ে যায় না, শুধু পরিবর্তিত হতে পারে। সামাজিক তথ্যগুলো শুধু অস্তিত্বশীল তাই নয়, সেগুলো ব্যক্তির ওপর প্রভাব ফেলে, তাকে নির্দেশ দেয়, তাকে গঠিত করে। ব্যক্তি যা করে তার বেশীর ভাগটাই সে সমাজ নিয়ম অনুসারে করে, প্রচলিত গৃহীত সর্বস্বীকৃত ধারাকে মেনে করে। ব্যক্তি তাই সমাজসমগ্রের অংশ, বিরাট সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই সে নানাভাবে নিজেকে বিকশিত করে। সমগ্রের যে ধর্ম *(property)* তা ব্যক্তির থেকে আসে না বরং সমগ্রের এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অস্তিত্ব আছে। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পৃথক পৃথকভাবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সমজ্জ্বল কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণের ফলে জল উৎপন্ন হলে তার মধ্যে নতুন গুণের আবির্ভাব হয়। সামাজিক তথ্যগুলো তাই ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি হিসেবে বা তাদের বিশ্বাসের সমষ্টি নয়, তাদের থেকে তার আছে স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। দুর্খায়েম বলেন ঃ

> ***The hardness of bronze is not in the copper, the tin or the lead, which are its ingredients and which are soft and malleable bodies; it is in their mixture.***

অন্যত্র এক জায়গায় তিনি লিখেছেন ঃ

> ***The group thought, felt and acted quite differently than its members would if they were isolated.***

সামাজিক ঘটনার নিয়মিতকরণের ক্ষমতা আসে ঘটনাবলীর বাস্তব অস্তিত্ব থেকে, বা বাহ্যিকতা থেকে। ধরা যাক, চুক্তির ধারণা। চুক্তির নিয়মাবলী ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে রচিত হয় এবং তা ব্যক্তির ওপর কর্তব্য ও দায়িত্ব অর্পণ করে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্যতম সামাজিক তথ্য হল চুক্তি এবং এই তথ্য কোন ব্যক্তি নিজস্ব ঝুঁকি নিয়েই কেবলমাত্র অস্বীকার বা লংঘন করতে পারে। একজন সামাজিক ব্যক্তি সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় একই রকম কথা বলে, একই নীতি মেনে চলে; অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গে সর্ম্পকের ক্ষেত্রে একই ধরনের আচরণ প্রকাশ করে। কি করতে হবে, কি করা উচিত নয়, কোনটা গ্রহণযোগ্য, কোনটা গ্রহণযোগ্য নয়, কোনটা একাএকা ভোগ করা যাবে, কোনটা সকলে মিলে ভোগ করতে হবে, কখন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে, কখন মাথা নীচু করতে হবে, প্রায় সকলেরই এসব ব্যাপারে একই রকম ধারণা থাকে। এগুলো সবই সমাজস্বীকৃত কর্তব্যকর্ম। দুর্খায়েম উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, একজন কারখানা মালিকও যদি চুক্তির নিয়মাবলী না মানে বা নতুন ধরনের আবিষ্কারকে গ্রহণ না করে তাহলে সে নিজের সর্বনাশই ডেকে আনবে। এভাবেই আমরা দেখি সামাজিক জীবনে সামাজিক তথ্যগুলোর একটা ব্যক্তি অতিরিক্ত অস্তিত্ব আছে এবং সেগুলো ব্যক্তির থেকে স্বতন্ত্র থেকে ব্যক্তির আচরণ, জীবনযাপন ও হাজারো রকম কর্মপ্রবাহে প্রভাব বিস্তার করে।

দুর্খায়েম তার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিকাশের ক্ষেত্রে একথা জোরের সঙ্গে বলেছেন যে সামাজিক ঘটনাসমূহ অন্তর্দর্শন, বিষয়ীগত মনস্তত্ত্ব বা আধিবিদ্যক দার্শনিক কোন ধরনের পদ্ধতি দিয়েই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। একমাত্র সমাজতত্ত্ব দিয়েই সামাজিক তথ্যগুলির ব্যাখ্যা করা সম্ভব; সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিই প্রকৃত পদ্ধতি। বাহ্যিক ও দৃশ্যমান বিষয়েই সামাজিক পর্যবেক্ষণ সম্ভব। ধর্মীয় আনুগত্য, বৈবাহিক প্রতিষ্ঠান, পরিবার, শ্রমবিভাগ, আত্মহনন,বিভিন্ন অর্থনৈতিক পেশা, পেশাভিত্তিক গোষ্ঠী এবং তাদের আচরণগত নিয়মকানুন প্রভৃতি সামাজিক তথ্যগুলো ব্যাখ্যা করতে হবে বাস্তবতার সঙ্গে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্খায়েম সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক তথ্য বলে অভিহিত করেছেন কারণ ব্যক্তির চিন্তাধারা, তার মানসিক গড়ন এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন আচরণ এগুলোর দ্বারাই নির্ধারিত এবং প্রভাবিত হয়ে থাকে। এগুলোকে কোন ব্যক্তিই এড়িয়ে যেতে পারে না। কোন না কোনভাবে এগুলোকে মেনে চলতেই হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দুর্খায়েম সমাজতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপত্তি ও কার্যাবলীর বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। সামাজিক ঘটনা বা তথ্যগুলোকে তিনি কখনই 'বাচ্য' বা প্রত্যয় বা শুধু ধারণা কাঠামো বলে মনে করেন নি। এগুলো সব সময়েই 'বস্তু'। তিনি *The Rules of Sociological Method* গ্রন্থে বলেন ঃ

> *Things include objects of knowledge that cannot be conceived by purely mental activity,these that required for their conception data from outside the mind from observations and expenments, those which are built up from the more external and immediately accessible characteristics to the less visible and more profound.*

সমাজতত্ত্বকে যদি প্রতিষ্ঠানের আলোচনা বলে গণ্য করা হয়, এবং প্রতিষ্ঠানগুলো যদি সমাজিক তথ্যের দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে, তবে সমাজতত্ত্ব মূলতঃ সামাজিক তথ্যের আলোচনা। এই সামাজিক ঘটনাগুলো সবই বাস্তব এবং ব্যক্তির পক্ষে এসবের বাইরে থাকা সম্ভব নয়। এখানেই দুর্খায়েম স্পেনসার থেকে নিজের অবস্থান পৃথক করেছেন। স্পেনসারের 'ব্যক্তি বনাম সমাজ' এরকম তত্ত্ব তিনি মানতে পারেন না। কারণ ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কোন বিরোধাত্মক সম্পর্ক তাঁর মতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। স্পেনসার ছিলেন বিপ্লবী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, প্রায় কিছুটা নৈরাজ্যবাদীর মতই। তিনি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিরোধী কারণ যেকোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ তার মতে ব্যক্তিগত বিকাশের শত্রু। স্পেনসার তাই শিশুকেও পিতামাতার আদেশ শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে চান। *'Let the child grow like plants.'* তিনি আরও বলেন *"Let the children be left free from the sweet care of their parents so that they may grow independently."* অপর দিকে দুর্খায়েম ছিলেন সমাজসত্তায় আস্থাশীল; ব্যক্তিকে তিনি অস্বীকার করেন নি; মার্ক্সের মতই তিনি বলেন যে ব্যক্তি সমাজের বাইরে নয়, ***সমাজের মধ্যে থেকেই তার যত ক্রিয়াকলাপ, চিন্তাভাবনা, কর্মপ্রবাহ, সামাজিক প্রভাবকে ব্যক্তি কখনই অস্বীকার করতে পারে না। বরং বিধিবিধান মেনে নিয়েই তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হতে পারে।*** দুর্খায়েম তাই বলেন, যেকোন সমাজবাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতে হবে গোষ্ঠীর মধ্যে দিয়ে, ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে তা হতে পারে না। সামাজিক ঘটনা যেহেতু ব্যক্তির উপর কতকগুলো নিয়ম ও দায়িত্ব অর্পণ করে এবং তাকে বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করে সেহেতু সামাজিক ঘটনা বা সামাজিক তথ্য তথাকথিত 'ব্যক্তিগত' ঘটনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এক অর্থে 'ব্যক্তি ঘটনা' বলে কিছু নেই; সবই সামাজিক। কি করতে হবে , কেমন করে করতে হবে, কোনটা কাম্য, কোনটা অকাম্য, কোনটা শুভ, কোনটা অশুভ এসব ব্যাপারে সামাজিকভাবেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে। আমরা কেউই সমাজের / সমাজবাস্তবতার ওপর দিয়ে শূণ্যের ওপর ভাসতে পারি না, বিচ্ছিন্ন থাকতে পারি না, সমাজের মধ্যে থেকেই আমরা সবকিছু করি এবং সমাজই আমাদের তা করতে নির্দেশ দেয়। ব্যক্তির আবেগ, অনুভূতি, ঘৃণা, ভালবাসা; গ্রহণ করা, বর্জন করা, বিভিন্ন অভ্যাস, প্রক্ষোভ সবই নিয়ন্ত্রণ করতে হয় কারণ ব্যক্তিগত কর্মপ্রক্রিয়া কেন্দ্রাতিগ *(centrifugal)* হলেও সামাজিক ঘটনা ও নিয়মিতকরণ সবসময়েই কেন্দ্রানুগ *(centripetal)*। কেন্দ্রাতিগ শক্তির থেকে কেন্দ্রানুগ শক্তি যে বেশী শক্তিশালী তা কে অস্বীকার করতে পারে? প্রাকৃতিক জগতেই শুধু নয়, সামাজিক বিশ্বেও এটা সমানভাবে প্রযোজ্য। দুর্খায়েম বলেন ঃ

> *The former are elaborated in individual consciouness and then tend to externalize themselves;the latter are at first to fashion their image from without.*

তিনি মানুষের বাস্তব সামাজিক জীবনের থেকে উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে ব্যক্তির আচরণ প্রক্রিয়া ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক ও জৈবপ্রকৃতি থেকে উদ্ভুত হয় না। তিনি বলেছেন ঃ

> *When I fulfil my obligation as brother,husband or citizen when I execute my contracts, I perform duties which are defined externally, I perform duties which are defined*

externally to myself and my acts in law and custom Even ıf they conform to my own segments and I feel theır reality, subjectively; such realıty is still objective,for I did not create them

অর্থাৎ ব্যক্তিব আবেগজাত অনুভূতিব মধ্যে বিষয়ীগত ব্যাপার থাকলেও, এই বাস্তবতাকে দুর্খায়েম বিষয়গত বলেই অভিহিত করেছেন। ব্যক্তির ওপর সামাজিক ঘটনাগুলো যে প্রভাব বিস্তার কবে বা ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে তা অনেক সময় অস্পষ্ট হতে পারে এবং সেগুলোর আলোচনা কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যক্তির আচরণের ওপর আইন ও প্রথার নির্ধারণকারী ভূমিকা সর্ম্পকে আলোচনা করা মোটেই অসুবিধাজনক নয়, কিন্তু ব্যক্তির ওপর জনতার বা ফ্যাশনের প্রভাব সর্ম্পকে আলোচনা করা খুবই কঠিন। দুর্খায়েম মনে করেন যে এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কঠিন হলেও এগুলোর আলোচনা করা উচিত এবং সমাজতত্ত্বের আলোচনা ক্ষেত্রের মধ্যে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরোও মন্তব্য করেন যে, সামাজিক কোন তথ্যের বা ঘটনার যদি স্বাধীন বিষয়গত অস্তিত্ব নাও থাকে, তবে সামাজতাত্ত্বিকের তাকে স্বাতন্ত্র্য দিতে হবে এবং সেভাবেই তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে।

সামাজিক ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরবর্তীকালে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসেছেন। পরবর্তীকালে তিনি নৈতিক আনুগত্যের ওপর বেশী বেশী জোর দিতে থাকেন; সামাজিক তথ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি *concience collective* বা সমষ্টিগত বিবেকের ওপর গুরুত্ব দেন। যৌথ বা সমষ্টিগত বিবেক হল অভিন্ন মানসিক ও নৈতিক গুণাবলী; দুর্খায়েমের মতে, সমাজে কতগুলো স্বীকৃত মূল্যবোধ থাকে যা সকলের মনে গ্রথিত হয়ে যায়, যা প্রত্যেক ব্যক্তি মেনে চলে বা প্রত্যেকে মেনে নেয় যে এগুলো মেনে চলা উচিত। কেউ যদি স্বীকৃত মূল্যবোধগুলো মেনে না চলে বা অমান্য করে তাকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়। আবার কোন কিছুকে সমা জ বিরুদ্ধ মনে করা হলে যে ব্যক্তি তা মনে করে তার বিরুদ্ধে সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণও করে থাকে। সমাজে যেসব নিষেধ বা *Taboos* প্রচলিত থাকে তাকেও দুর্খায়েম অনেক সময় *'Conscience Collective'* বলে উল্লেখ করেছেন। কোন সমাজে মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ থাকতে পারে, কোন সমাজে বিবাহ অপর গোষ্ঠীর থেকে করা যাবে না, ইত্যাদি। এই মূল্যবোধগুলো ব্যক্তিনির্ভর নয়, বিষয়গত। ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে এই সব নীতিমালার অস্তিত্ব; এই মূল্যবোধ বা নীতিমালা সম্পর্কে এক ধরণের ঐক্যবোধ থাকে এবং বিশেষ বিশেষ সামাজিক তথ্য সম্পর্কে একই মনোভাব সৃষ্টি হয়। *The Determination of the Moral Facts* তে দুর্খায়েম নৈতিক মূল্যবোধকে সামাজিক তথ্য হিসেবেই দেখেছেন। নৈতিকতার তিনি দুটি দিকের উল্লেখ করেছেন : এক দিকে এটা ব্যক্তির মধ্যে তার কর্তব্য সম্পর্কে মনোভাব তৈরী করে, অপর দিকে সামগ্রিক মঙ্গলের কথা এই নৈতিক বিধির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। নৈতিকতা ঠিক আদেশ নয়; এর পিছনে শক্তি কাজ করে না; এর পেছনে জনগণের অনুভূতি,আবেগ ও ইচ্ছা কাজ করে। জনগণ ভাবে যে এগুলো প্রয়োজনীয় এবং সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক তাই এগুলো তারা মেনে চলে। এদিকে থেকে দুর্খায়েম সঠিকভাবেই বলেছেন ঃ

Obligation or duty is one aspect abstracted from morality. A certain degree of desirability is another characteristic not less important than the first.

অর্থাৎ নৈতিকতা সমাজেরই দান। সমাজকে ত্যাগ না করে আমরা নৈতিকতাকে ত্যাগ করতে পারি না। সমষ্টিগত ইচ্ছাই আমাদের বলে দেয় কোনটা আমাদের পক্ষে ভাল এবং কোনটা আমাদের পক্ষে খারাপ। এবং সেদিক থেকে ধর্মের মতই নৈতিকতা একটা সামাজিক তথ্য বা ঘটনা, যা ব্যক্তির অর্ন্তভূক্ত হিসেবে থাকে এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে থাকে। দুর্খায়েমের এই সব ধারণা রুশোপন্থী বলে আমাদের মনে হয়। রুশোর সাধারণ তত্ত্ব এবং দুর্খায়েমের *conscience collective* এর মধ্যে দুস্তর কোন ব্যবধান নেই বলে আমাদের বিশ্বাস। রুশোর সাধারণ ইচ্ছার মতই এই *'Conscience Collective'* এর উৎস ব্যক্তি নয়; ব্যক্তি-অতিরিক্ত উচ্চতর উৎস থেকেই এর উদ্ভব; সেই কারণে ব্যক্তি একে মেনে চলে। সমাজের মধ্য দিয়েই এই নৈতিকতা প্রবাহিত হয়।

সমাজ হ'ল বিভিন্ন ব্যক্তির ভাবের আদান প্রদানের ক্ষেত্র; এই ভাবের আদান প্রদান প্রগাঢ় হলে তবে তা মূল্যবোধে রূপান্তরিত হয়; আর এই মূল্যবোধই ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থ নিয়ন্ত্রণ করে ও তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। দুর্খায়েম তাই ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব আছে বলে মানতে চান না।

সামাজিক মূল্যবোধ ছাড়া কোন সমাজই টিকে থাকতে পারে না। দুর্খায়েম তাই বলেন ঃ

Through the awareness of itself society forces the individual to transcend himself and to participate in the higher form of life. A society cannot be constructed without creating ideals.

এই সমষ্টিগত চেতনা বা সামাজিক আদর্শগুলোকে তিনি সমাজের এবং সমাজস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেছেন। সমষ্টিগত চেতনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

Society is not at all the illogical or logical incohrent and fantastic being which it has often been considered. Quite on the contray, the collective consciouness is the highest form of the psychic life, since it is the consciousness of the consciousnesses. Being placed outside of and above individual and local contingencies, it sees things only in their permanent and essential aspects which it crystalizes into communication ideas. Society sees further and better than individual.

দুর্খায়েম ব্যক্তিগত ও সামাজিক সচেতনতার মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে গোষ্ঠী তার সদস্যবৃন্দ থেকে ভিন্ন ভাবে চিন্তা করে, অনুভব করে এবং কার্য করে। যদি সদস্যবৃন্দ নিজেদের বিচ্ছিন্নভাবে দেখে তাহলে গোষ্ঠীর মধ্যে কি হচ্ছে তা বুঝতে পারে না। কিন্তু আসলে গোষ্ঠীচেতনাকে কখনই পুরোপুরি অতিক্রম করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ব্যক্তি

তাই সামাজিক চেতনার কাছে নত হয় এবং তাকে কোন না কোনভাবে মেনে চলে। সমষ্টিগত চেতনাকে সমাজের এক মনস্তাত্ত্বিক রূপ হিসেবেও দুর্খায়েম দেখেছেন। সমাজের যেমন নিজস্ব বিকাশের রূপ আছে, তার নিজস্ব ধর্ম আছে এবং তার অস্তিত্বের বিভিন্ন কারণ আছে, তেমনি সামাজিক চেতনারও নিজস্ব বিকাশ ও নিজস্ব ধর্ম আছে, যা ব্যক্তির বিকাশের সঙ্গে মেলে না।

দুর্খায়েম যখন সমষ্টিগত সচেতনতার কথা বলেন তখন তাকে বিরামহীন বিকাশের মধ্যে দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করেন। একে কখনই তিনি শেষ হয়ে যাওয়া বা স্থির নির্দিষ্ট কিছু বলে ভাবেন না। সমষ্টিগত চেতনার বিষয়টি মানুষের সংঘমূলক কর্মপ্রবাহের ওপর নির্ভরশীল। আন্তঃক্রিয়া ও সংঘমূলক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই সামাজিক জীবনের সৃষ্টি এবং এটাই হল 'সংঘমূলক বাস্তবতা'।

কিন্তু এ বিষয়ে একটা জিনিস আমাদের মনে রাখা দরকার যে দুর্খায়েম কখনই সমাজ, সামাজিক চেতনা বা সামাজিক তথ্য কোনকিছুকেই রহস্যাবৃত করেন নি। আদিভৌতিক কোন চরিত্র সমাজের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না; এটা বাস্তব ও বাস্তবজীবনেরই প্রতিফলন। তিনি শুধু এটাই বলেছেন যে একটা বিশ্বাস, বা প্রথা, বা সামাজিক কর্মক্রিয়া ব্যক্তিগত প্রকাশ হিসেবে না থেকে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে। একথা তিনি তার সমাজতাত্ত্বিক গ্রন্থের কোথাও বলেন নি যে সমাজ ব্যক্তি ছাড়া সম্ভব, সমাজের বা সামাজিক তথ্যের স্বাধীন অস্তিত্বের অর্থ হ'ল সমাজ বা সামাজিক তথ্যের একটা সামগ্রিকতা আছে, ব্যক্তিনিরপেক্ষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক হল অংশ ও সমগ্রের মধ্যে সম্পর্ক। ধর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়েও তিনি ধর্মকে সামাজিক তথ্য হিসেবেই দেখেছেন; ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে দেখেন নি। আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে ধর্মকে না দেখে সমাজবাস্তবতার এক প্রকাশ হিসেবেই দেখেছেন। ধর্মকে অতি জাগতিক বিষয় করে তোলেন নি। ধর্মের সামাজিক উৎস সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমাজকেই ঈশ্বর বা 'সমাজ ঈশ্বর' বলেছেন।

আসলে মূল্যবোধজাত কাঠামোর মধ্যে দুর্খায়েম খুঁজে পান সামাজিক সংগতিবিধানের মূল সূত্রকে। মানুষের পারস্পরিক আদান প্রদানের মধ্যে দিয়েই সামাজিক সংহতি সৃষ্টি হয়। যেমন আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেই বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী তাদের সদস্যদের একত্রিত করে। তবে দুর্খায়েম একথাও ভুলে যাননি যে সব সমাজের মধ্যেই কতকগুলো অসংগতিমূলক উপাদান থাকতে পারে কারণ কোন একটা বিষয়ে পরিপূর্ণ ঐক্যমত কখনই থাকে না।

সংক্ষেপে সামাজিক ঘটনা, বিশেষ করে নৈতিক আচরণবিধি ব্যক্তির জীবনে তখনি প্রভাব বিস্তার করে যখন এই আচরণবিধিগুলোকে মানুষ তাদের কর্তব্যবোধের সঙ্গে যুক্ত করে। দুর্খায়েমের ভাষায় ঃ

> *Constraint is a moral obligation to obey a rule. Society is something beyond us and something in ourselves.*

অর্থাৎ দুর্খায়েম ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এক অন্তর্জাত সম্পর্কের কথা বলেন। সমাজ একই সঙ্গে আমাদের বাইরে আবার আমাদের ভেতরে। আধুনিককালের অন্যতম সমাজতাত্ত্বিক *Peter Berger* তাঁর *Invitation to Sociology* তে ঠিক এই কথাই বলেছেন যখন তিনি দুটি অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন *Society as the Individual* এবং *Individual in the Society*। সমাজের মধ্যে মানুষ আবার মানুষের মধ্যে সমাজ। একে অপরের সাথে গ্রথিত।

দুর্খায়েম শুধু এটাই বলেছেন, যে গ্রথিত হয়েও সমাজ স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে। মানুষের বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল তার *Sociality*- সামাজিকতা।

সামাজিক ঘটনা সম্পর্কে দুর্খায়েমের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আত্মহনন সম্পর্কিত বিশ্লেষণ। *Le Suicide* গ্রন্থটি এক হিসেবে সামাজিক ঘটনা বা তথ্যের বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে তোলার সাফল্যময় প্রচেষ্টা। এখানে তিনি আত্মহননকে 'ব্যক্তিক' হিসেবে না দেখে সামাজিক ঘটনা হিসেবে দেখেছেন। মনোবিদ্যাগত, জীববিদ্যাগত ও জলবায়ুকেন্দ্রিক কারণকে যাঁরা আত্মহনন বিচারের মানদন্ড করতেন দুর্খায়েম তাদের সমালোচনা করে বলেছেন যে ব্যক্তিই আত্মহনন করে কিন্তু তা করে সামাজিক অবস্থার চাপে। ভাষান্তরে বলা যায়, আত্মহনন হ'ল সামাজিক ঘটনা বা তথ্য *(Social facts)*। আত্মহননের সংখ্যা ও সামাজিক অপরাপর তথ্যের সম্পর্ক বিচার করে দুর্খায়েম বলেন যে সামাজিক গোষ্ঠীজীবনে যেখানে ব্যক্তিগণ সংহতি বা ঐক্য অনুভব করে সেখানে আত্মহননের সংখ্যা কম আর যেখানে সামাজিক সংহতির অভাব দেখা যায় সেখানে আত্মহননের সংখ্যা বেশী। বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত তথ্য ব্যবহার করে তিনি বলেছেন যে সামাজিক পরিস্থিতিগত কারণেই আত্মহননের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। ক্যাথলিকদের থেকে প্রোটেস্ট্যান্টগণ, বিবাহিত ব্যক্তির থেকে অবিবাহিতগণ, গ্রামবাসীদের থেকে শহুরে লোক বেশী আত্মহনন করে।

একইভাবে পারিবারিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও আত্মহননের তারতম্য ঘটে। যে পরিবারে সংহতিমূলক বন্ধন প্রগাঢ় সেখানে আত্মহননের সংখ্যা কম। তাঁর গবেষণা এটা দেখিয়েছে যে অবিবাহিত ব্যক্তি কিংবা সন্তানহীন বিবাহিত ব্যক্তিরা আত্মহনন করে বেশী। যে পরিবারে সন্তান সংখ্যা বেশী সেখানে বন্ধন দৃঢ় হয়, যেখানে সন্তান সংখ্যা কম সেখানে বাবা মায়েরা বেশী আত্মহনন করে। আবার ক্যাথলিকদের মধ্যে সামাজিক সংহতিবোধ বেশী এবং গীর্জাও ব্যক্তির ওপরে প্রাধান্য ভোগ করে ফলে ক্যাথলিকদের মধ্যে আত্মহননের প্রবণতা কম দেখা যায়। প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে আত্মহননের প্রবণতা বেশী কারণ এই ধর্মীয় সম্প্রদায় স্বাধীন চিন্তার সমর্থক এবং ব্যক্তি ধর্ম সম্পর্কে নিজস্ব ব্যক্তিগত মনোভাবকে প্রকাশ করতে পারে। ফলে সামাজিক সংহতির অভাবে এরা আত্মহনন করে বেশী।

দুর্খায়েমের মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল এটাই দেখানো যে যেখানে সামাজিক সংহতি বেশী, সমাজস্থ ব্যক্তির ওপর গোষ্ঠীর নৈতিক চাপ বেশী সেখানে আত্মহননের প্রবণতা কম। ***আত্মহননের বিরুদ্ধে নৈতিক চাপ আত্মহননে বাধা দেয়।*** সব থেকে বড় কথা হল মানুষ সামাজিক জীব; সামাজিক জীব হিসেবে সে কতকগুলো সামাজিক আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য কতকগুললো নিয়মকানুন মেনে চলে। যত বেশী সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ততই সে সামাজিক ব্যক্তি হিসেবে সামাজিক কর্ম প্রবাহে কম অংশগ্রহণ করে। এইভাবেই সে জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। উদ্দেশ্যহীন ও লক্ষ্যহীন জীবনে সামান্য পরিস্থিতিগত কারণেই সে আত্মহনন করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

দুর্খায়েম দেখাতে চেয়েছেন যে ব্যক্তিগত ইচ্ছা বড় কথা নয়, সামাজিক পরিস্থিতির কারণেই ব্যক্তি আত্মহননের দিকে এগিয়ে যায়। দুর্খায়েম বলেছেন ঃ

> ***There is, therefore, for each people (society) a collective force of a definite amount of energy, impelling men to self destruction.***

সামাজিক অবস্থার সাথে সংহতিবিধান করেই ব্যক্তি চলতে পারে কারণ সমাজের তুলনায় ব্যক্তি খুবই ছোট।

The individual alone is not a sufficient end for his activity. He is too little

এভাবে সামাজিক তথ্য বা ঘটনাগুলোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে এবং বিষয়গতভাবে সেগুলোর ব্যাখ্যা করতে হবে এ কথা ঘোষণা করে দুর্খায়েম পুরোনো ইষ্টবাদী ঘরানার শুন্যগর্ভ বিমূর্তনকে অতিক্রম করেছিলেন।কোঁৎ শেষ পর্যন্ত আদর্শবাদী থেকে গিয়েছিলেন; তাঁর সমাজতত্ত্ব আসলে ছিল ইষ্টবাদী দর্শন *(positivist philosophy)*। তাঁর কল্পিত সমাজ ইষ্টবাদী সমাজ যা কিছুটা বিমূর্তন, কিছুটা দার্শনিক প্রক্ষেপ। কিন্তু দুর্খায়েমের ত্রুটি হ'ল তিনি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অগ্রগতির সাধারণ ধারণাকে পরিত্যাগ করে তাঁর সমাজতাত্ত্বিক প্রচেষ্টাকে সামাজিক জীবনের কতকগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে (যেমন আত্মহননকে) তাঁর গবেষণার বিষয় করে তুললেন। আত্মহননের ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তা নয়, কিন্তু সামগ্রিক সামাজিক ঘটনা শুধু সামাজিক *(Social)* কারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তার থাকে অর্থনৈতিক উৎসও। মার্ক্সের মূল বিষয় ছিল সামাজিক বাস্তবতা কিন্তু মার্ক্স সেই বাস্তবতাকে দেখেছেন সামাজিক- অর্থনৈতিক সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক মিথষ্ক্রিয়ার মধ্যে। সামগ্রিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ঐতিহাসিক বিশেষতাকে (যেমন ধনতন্ত্র) মার্ক্স ব্যাখ্যা করেছিলেন। শুধু বর্তমান বিশ্বের ব্যাখ্যা না করে তিনি অতীতের সঙ্গে বর্তমান এবং বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যৎকে যুক্ত করে তার বিশ্লেষণধারার বিকাশ ঘটিয়েছেন। দুর্খায়েমের এই সামগ্রিক ধারণা ছিল না।

তাছাড়া দুর্খায়েম যখন সামাজিক ঘটনাগুলোকে বস্তু হিসেবে দেখেন তখন একে পদ্ধতিগত দৃষ্টির আলোকে ব্যাখ্যা করেন, কোন জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে এগুলোর যুক্তিগ্রাহ্যতা ব্যাখ্যা করেন না। যেভাবে আমরা প্রাকৃতিক বস্তুর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করি, সেভাবেই দুর্খায়েম সামাজিক ঘটনাকে দেখেন। কিন্তু সামাজিক বিশ্ব প্রাকৃতিক জগতের বিশ্বের মত নয়; সমাজকে ব্যাখ্যা করার সময় আমরা এক পূর্ব বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত সমাজের মধ্যে প্রবেশ করি। অর্থাৎ মানুষ এক অর্থপূর্ণ সামাজিক পৃথিবীতে বাস করে এবং এই অর্থপূর্ণ সামাজিক বিশ্বের নতুন নতুন অর্থ খুঁজতে চায় এবং তাকে পরিবর্তনও করতে চায়। সব সামাজিক ঘটনাই ব্যাখ্যামূলক আর সামাজিক ঘটনাগুলো মানুষেরই কর্মপ্রক্রিয়া ও চিন্তাপ্রক্রিয়ার ফল। সমাজ কিছুই করে না, সব কিছুই মানুষ করে, সেদিক থেকে সামাজিক ঘটনা 'বস্তু নয়' মানুষের সচেতন কর্ম, তাই স্থির নয়, পরিবর্তনশীল ও বিরামহীনভাবে বিকাশশীল। মার্ক্সের সামাজিক বাস্তবতা ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে অমরা এটাই পেয়েছি। দুর্খায়েম এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, তা বলব না, কিন্তু তাঁর আলোচনা অসম্পূর্ণ। এর কারণ হ'ল তার শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা, বুর্জোয়া উদারনীতিবাদী পরিকল্পের বাইরে তিনি যেতে পারেন নি, তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না।

সামাজিক শ্রমবিভাগ-সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

The universal essences are objective, they exist outside and independently of the human mind and constitute a special world — Karl Popper

শ্রমবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দুর্খায়েম শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকে একে ব্যাখ্যা না করে সামাজিক বিষয় বা তথ্য হিসেবে দেখেছেন। সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগেব বিরাট ভূমিকার তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। দুর্খায়েমের শ্রমবিভাগ তত্ত্ব সমাজতত্ত্বে এক মূল্যবান অবদান হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর পূর্বে জে. এস. মিল এবং হার্বার্ট স্পেনসার এমনকী অগাস্ত কোঁৎ শ্রমবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউই এই বিষয়কে তাত্ত্বিক রূপ দেন নি। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন নি। অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ এবং পরবর্তীকালে মার্ক্স শ্রমবিভাগের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দুর্খায়েম শ্রমবিভাগ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা কোঁৎ প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকদের দেয়া ব্যাখ্যা এবং কার্ল মার্ক্সের ব্যাখ্যার থেকে স্বতন্ত্র। শ্রমবিভাগকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা দুর্খায়েমেরই কৃতিত্ব। তিনি শ্রমবিভাগকে সমাজ পরিবর্তন ও বিবর্তনের গুরুত্বপূণ উপাদান বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি শ্রমবিভাগকে এক স্বাধীন কারক (independent variable) হিসেবে দেখেছেন এবং অপরাপর সামাজিক বিষয়গুলো যে এর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বা এর সঙ্গে কোন না কোনভাবে যুক্ত তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তিনি এ মন্তব্যও করেছেন যে সমাজ ও সভ্যতার সঠিক বিশ্লেষণ সম্ভব যদি শ্রমবিভাগ সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণ করা যায়। দুর্খায়েমের মতে, সমাজ সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকেই শ্রমবিভাগের অস্তিত্ব ছিল, তবে আধুনিককালের শ্রমবিভাগের জটিলতা ছিল না। সমাজ জটিল হয়ে পড়লে বা 'জটিলতাময় সমগ্র' হয়ে উঠলে শ্রমবিভাগও জটিল রূপ গ্রহণ করে। শ্রমবিভাগের রূপের পরিবর্তন হতে হতে একটা নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট রূপ নেয় কিন্তু শ্রমবিভাগের প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায় না।

জনসংখ্যাবৃদ্ধি বা ঘনত্বের (density of population) কারণে সমাজ জটিল আকার ধারণ করে এবং বিশেষীকরণ হতে থাকে এবং শ্রমবিভাগের অনিবার্যতা বাস্তব হয়ে ওঠে। *দুর্খায়েমের মতে, শ্রমবিভাগ সমাজসমগ্রের জন্য এক প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা। এর রয়েছে ক্রিয়ামূলক অস্তিত্ব (Functional existence)।* ***Division of Labour in Society*** গ্রন্থে দুর্খায়েম বলেন যে সামাজিক বিকাশের অন্যতম প্রয়োজনীয় শর্তই হ'ল শ্রমবিভাগ ও এর ওপরে ভিত্তি করেই সমাজসমগ্র দাঁড়িয়ে আছে এবং বিবর্তিত হচ্ছে। পরিবার থেকে আরম্ভ করে বড় বড় গোষ্ঠী, সংঘ, ব্যবসায়িক সংগঠন এবং রাষ্ট্র শ্রমবিভাগ শাসিত। দুর্খায়েম তাই শ্রমবিভাগকে শুধুমাত্র অর্থনীতির বিষয় হিসেবে না দেখে সামগ্রিক সামাজিক প্রয়োজনীয়তার

আলোকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করেছেন, দুর্খায়েমের বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার প্রাথমিক সূত্র হল শ্রমবিভাগ। যেমন, ট্যালকট পার্সনস্ বলেছেন ঃ

> It contains germs of almost all essestial elements of Durkheim's later theoretical development.

পার্সনস্ এর সঙ্গে আমরা ঐক্যমত পোষণ করি বা না করি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে দুর্খায়েম শ্রমবিভাগের বিষয়কে অত্যন্ত সচেতনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সংরক্ষণে, সমাজসংহতিতে যে এটা বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে তার এক কার্মিক (functional) ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

মার্ক্স যেখানে শ্রমবিভাগ সম্পর্কে হতাশাবাদী সেখানে দুর্খায়েম ততটাই আশাবাদী। শ্রমবিভাগকে মার্ক্স শোষণব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম বলে ঘোষণা করেছেন। সেখানে দুর্খায়েম শ্রমবিভাগকে সমাজপ্রগতির অন্যতম কারক বলে অভিহিত করেছেন। মার্ক্স তাঁর Grundrisse তে পরিষ্কারভাবে বলেন যে শ্রমবিভাগ ও বিনিময়ব্যবস্থা শোষণব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার অন্যতম উৎসও। মার্ক্সের মতে শ্রমবিভাগের মাধ্যমেই মানুষকে মাত্র একটি বিশেষ কাজের মধ্যে শৃঙ্খলিত করা হয়ে থাকে; এতে তার যথার্থ সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ হয় না; শ্রমের আনন্দই এখানে লুণ্ঠিত। শ্রমবিভাগের ফলে মানুষ, বিশেষ করে শিল্পে কর্মরত মানুষ বিশাল যন্ত্রব্যবস্থার একটা ক্ষুদ্র 'অণু' মাত্র, একটা একঘেয়ে কাজের মধ্যে নিজের সমস্ত শক্তিকে ব্যয় করতে মানুষ বাধ্য হয়। পেশাগত ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় বলে এই কাজের মধ্যে সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরতে পারে না। এথেকে বেরোবার পথ নেই। শ্রমবিভাগেব বিষয়টি 'উৎপাদন সম্পর্কের' সাধারণ চরিত্র অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া মার্ক্সের আরও সুস্পষ্ট অভিমত হ'ল শ্রমবিভাগের ফলে মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীতে ও গোষ্ঠীতে অস্তিমান আর নাস্তিমান (haves and have nots) এ- বিভক্ত হয়ে পড়ে।

দুর্খায়েম শিল্পসমাজের ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালী থেকে উদ্ভুত এই সব সমস্যা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না তা নয়, কিন্তু মার্ক্সের মত শ্রমবিভাগের নেতিবাচক দিকগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে শ্রমবিভাগের সামাজিক ইতিবাচক ভূমিকার ওপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। ***Division of Labour in Society*** গ্রন্থে তিনি শ্রমবিভাগের সার্বজনীন ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উৎপাদন প্রণালী বা বিশেষ সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Socio-economic formation) থেকে পৃথক করে নিয়ে তিনি এর ব্যাখ্যা করেছেন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে শ্রমবিভাগ ধারণা হিসেবে এবং সামাজিক বাস্তবতা হিসেবে বহু পুরানো; কিন্তু শ্রমবিভাগের সার্বজনীন ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিশেষ রূপের আলোচনা না করে, নির্দিষ্ট উৎপাদনব্যবস্থাকে তার সঙ্গে যুক্ত না করে শ্রমবিভাগের বিষয় কে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা করে এর প্রকৃত ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে দুর্খায়েম ব্যর্থ হয়েছেন। শ্রমবিভাগ সম্পর্কে দুর্খায়েমের বিশ্লেষণ ধারার সঙ্গে এখানেই মার্ক্সের বিশ্লেষণধারার মৌলিক পার্থক্য। *মার্ক্স শ্রমবিভাগকে ব্যাখ্যা করেছেন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে, ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে, আর দুর্খায়েম শ্রমবিভাগকেই কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যেন শ্রমবিভাগই ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করে।*

দুর্খায়েম শিল্পসমাজের সঙ্গে পূর্ববর্তী সমাজের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য করেছেন শ্রমবিভাগকে ভিত্তি করে। তিনি বলেছেন, আদিম সমাজে শ্রমবিভাগ ছিল; তা ছিল নারী ও পুরুষের মধ্যে; পুরুষের কাজ ছিল মাঠে আর নারীর কাজ ছিল উনুনের পাশে, অর্থাৎ ঘরগিরস্থালীর কাজ। এই সমাজে সামাজিক সংহতি ছিল কিন্তু তা ছিল, তাঁর ভাষায়, যান্ত্রিক সংহতি। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পার্থক্য স্বীকৃত ছিল না। শ্রমবিভাগ প্রক্রিয়া ছিল অবিশেষিত। সামাজিক সংহতি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সাদৃশ্যের বা সমরূপতার (uniformity) ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাদের মধ্যে একই ধরনের বিশ্বাস বা মূল্যবোধ ছিল। ভূমিকাগত কোন পার্থক্য ছিল না। সমাজ সদস্যদের মধ্যে সম্প্রদায়গত জীবনের মাপকাঠি ছিল সমরূপতা। এই ধরনের যান্ত্রিক সংহতি প্রসঙ্গে দুর্খায়েম লিখেছেন ঃ

> Solidarity which comes from likeness is at its maximum when the collective conscience completely envelops our whole conscience and coincides with all points in it. But at that moment our individuality is nil. It can be borne only if the community takes a small toll of us.

এই সমাজে পেশাগত বৈচিত্রের কোন স্থান নেই; সবাই হয় শিকারী নয়তো কৃষক। বৈচিত্রময় কর্ম ও পেশা একেবারেই অনুপস্থিত।

এই ধরনের যান্ত্রিক সমাজ সংহতিতে মানুষের চেতনা, তার চিন্তাভাবনা, আচার-আচরণ একই ধরনের ব্যবস্থা থেকে সৃষ্টি হয়। পৃথকীকরণের বা পার্থক্যের কোন চিহ্ন এখানে থাকে না। ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বলে কিছু থাকে না। সমগ্র সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি যেন 'concrete' বা দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে। এই ধরনের সংহতি যান্ত্রিক এই কারণে যে এটা যেন ওপর থেকে চাপানো বিষয়। প্রচলিত সমাজবিশ্বাসের বাইরে যাবার কোন রকম উপায় নেই, বিচ্যুতির কোন স্থান নেই, ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের কোন উপায় নেই। কেউ কোন প্রচলিত বিশ্বাস, প্রথা বা লোকাচার বা সমাজস্বীকৃত আচরণ উপেক্ষা বা লংঘন করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকে। সামাজিক সমষ্টিগত চেতনাই ব্যক্তির চেতনা, ব্যক্তির সমাজ অতিরিক্ত কোন চেতনা নেই। দুর্খায়েমের এই যান্ত্রিক সংহতির ধারণা কিছুটা ধর্মীয় বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। পরবর্তীকালে দুর্খায়েম ধর্মের যে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তারও সূত্রপাত এই যান্ত্রিক সংহতির বিশ্লেষণের মধ্যেই রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাসকাঠামোর মধ্যেও থাকে একরূপতা; এক সঙ্গে বসবাস করা ব্যক্তিদের মধ্যে থাকে একই রকম বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের অর্থ সম্পর্কে একই দৃষ্টিভঙ্গি। আসলে দুর্খায়েম সামাজিক সব কিছুকেই ধর্মীয় রূপ দিয়েছেন, ধর্মনৈতিক সাংস্কৃতিক কাঠামোর মত করে তুলেছেন। অন্ততঃ যান্ত্রিক সংহতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একথা নিশ্চিত করে বলা চলে।

কিন্তু দুর্খায়েম একথাও বলেন যে ধর্মীয় নৈতিকতাবোধ ধীরে ধীরে অপসৃত হতে থাকে। যান্ত্রিক সংহতিও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। আধুনিক শিল্পসমাজ এবং শ্রমবিভাগ যেন একই বিষয়ের দুটি ভাগ। শিল্পসমাজের কর্মধারা বহুদিকে বিস্তৃত; শ্রমবিভাগের ফলেই জনগণের বিভিন্ন অংশ বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হতে পেরেছে এবং ফলস্বরূপ বিভিন্ন পেশাভিত্তিক কাজে নিযুক্ত হতে পেরেছে। পেশাগত বিভিন্নতাই আধুনিক শিল্পসমাজের বৈশিষ্ট্য। শিল্পসমাজের

আব একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিযোগিতা; প্রতিযোগিতার জন্যই নানাধরনের পেশা ক্রমাগত বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। কর্মের ক্রমবর্ধমান বিশেষীকরণের ফলে মানুষ বিভিন্ন কর্মে অংশগ্রহণ করে; নানা ধরনের পেশার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনধাবা গড়ে ওঠে। যান্ত্রিক সমষ্টিগত চেতনা বা সমষ্টিবাদ ব্যক্তিগতস্বাতন্ত্র্যবাদকে পথ করে দেয়; সমষ্টিগত সম্পত্তির স্থলে দেখা দেয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবস্থা, সমষ্টিগত দায়বোধ পরিবর্তিত হয়ে আসে ব্যক্তিগত অধিকারবোধ; সম্প্রদায়গত জীবন পরিবর্তিত হয়ে সামাজিক জীবন শ্রেণী ও নানাধরনের পেশাগত গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। শ্রমবিভাগের ফলেই মানুষে মানুষে পার্থক্য দেখা দেয়, প্রত্যেকেই নিজেব নিজের মতো করে নিজেকে বিকশিত করে তোলে, ব্যক্তিগত সামর্থ ও মেধা অনুসারে তাদেব পেশাগত ভূমিকা পালন করে। *প্রতিটি ব্যক্তিই এক একটি ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে।* শ্রমবিভাগেব ওপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করে ; যেহেতু প্রতি ব্যক্তি শুধু তার কাজেই দক্ষ, তাই অপরের সাথে তাকে সম্পর্কের মধ্যে আসতেই হয। কাবণ একার পক্ষে সব কাজ কবা সম্ভব নয়। অন্য ভাষায়, শ্রমবিভাগ যেমন কর্মের পেশাগত বিস্তৃতসাধন করে, তেমনি আবাব পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টারও গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই সহযোগিতামূলক সংহতিও শ্রমবিভাগের অন্যতম ফল। কিন্তু এটা যান্ত্রিক সংহতি নয়, এটা হ'ল 'অন্তর্জাত' বা 'জৈব সংহতি'।

অন্যভাষায়, কাজ করতে গিয়ে মানুষ মানুষের সঙ্গে একধরণের সম্পর্কের মধ্যে আসে, যা ঠিক ওপর থেকে চাপানো নয়; ব্যক্তিগণ নিজস্ব তাগিদেই ওই সম্পর্ক গড়ে তোলে; শ্রমবিভাগের ফলে উদ্ভূত কর্মের ধরনের কারণেই মানুষ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে আসতে বাধ্য হয়। বিকশিত শিল্পসমাজে সংহতি শ্রমবিভাগের প্রত্যক্ষ ও স্বাভাবিক ফল বলে দুর্খায়েম মন্তব্য করেন। শ্রমবিভাগ অনুসারে ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন বা বিশেষ বিশেষ কাজ জৈবদেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের কাজের মতো। সেই কারণেই দুর্খায়েম শিল্পসমাজের সংহতিকে জৈব সংহতি নাম দিয়েছেন। মানুষের দেহে থাকে মস্তিস্ক, হৃৎপিন্ড, লিভার প্রভৃতি এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন কাজ; কিন্তু প্রত্যেকেই সমগ্র দেহের 'সংরক্ষণের' জন্যই কাজ করে। একইভাবে সমাজসত্তায় বিভিন্ন ব্যক্তি,গোষ্ঠী বিভিন্ন কাজের মাধ্যমেই সমাজসত্তাকে সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ শিল্পসংহতি সহযোগিতার ওপর ভিত্তিশীল; এখানে প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র মূল্য আছে, স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে; শ্রমবিভাগই মানুষের মধ্যে বৈচিত্রময় পার্থক্যকে স্বীকার করে, সমাজকে একমাত্রিক যান্ত্রিক ব্যাপারে পরিণত করে না। পেশাগত ভূমিকা পালনের জন্য সকলেই সর্বাধিক সচেষ্ট; প্রত্যেকে তার ভূমিকা উত্তমরূপে পালনের জন্য অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এবং সামগ্রিকভাবে সহযোগিতায় আবদ্ধ হয়। *বিশেষীকরণের বড় কথাই হ'ল সহযোগিতা।* কোন একটি শিল্পে কোন দ্রব্যবাজারে ছাড়ার জন্য প্রয়োজন হয় নানা ধরনের বিশেষজ্ঞদেরঃ ইঞ্জিনিয়ার, ডিজাইনার, উৎপাদক এবং বিজ্ঞাপন ব্যবস্থার। দ্রব্য উৎপাদণের জন্য কর্মরত মানুষের। সুতরাং *শিল্পসমাজের সদস্যরা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল, আবার প্রত্যেকই স্বাধীন।*

প্রত্যেকের স্বতন্ত্র চেতনা থাকে, ধারণাকাঠামো থাকে, নিজের পেশা সম্পর্কে দক্ষতা থাকে, ফলে একধরনের গর্ববোধও থাকে; কিন্তু শিল্পসমাজও নিয়মকানুনের বাইরে যেতে পারে না; শিল্পসমাজ সেই অর্থে কোন নৈরাজ্যিক সমাজ নয়। প্রত্যেকের কর্ম করার স্বাধীনতা থাকে একথা বলার অর্থ হ'ল কেউই সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়; প্রত্যেকেই সামাজিক ধরনের এক বিশেষ

ব্যবস্থা দ্বারা সম্পর্কিত হয়, চালিত হয়। একজনের সঙ্গে অপরের সম্পর্কের মধ্যে একটা চেতনা বা অনুভূতির সৃষ্টি হয়, যেন তারা সমগ্রেব স্বার্থের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এমনি এক সংহতির চেতনা আসে, বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া চলে না, তা সে যান্ত্রিক হোক আর জৈবই হোক। আর সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোল সংহতি।

> And since division of labour became chief source of social solidarity, it becomes at the same time, the foundation of moral order.

শিল্পসমাজে পেশাগত ভূমিকা বিশেষীকৃত; এর ওপরেই এই সমাজের ইমারত দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এক সঙ্গে কাজ করার সুবাদে একটা সামাজিক একক (Social unit) গঠন করাও সম্ভব হয়ে ওঠে। নতুন ধরনের সমাজের জন্য প্রয়োজন হয় নতুন ধরনের চেতনা, একটা নতুন ধরনের নৈতিক শৃঙ্খলা (Moral order)। *মার্ক্স যেখানে শ্রমবিভাগকে বিভেদকামী শক্তি হিসেবে, শোষণের অনিবার্য মাধ্যম হিসেবে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্বের কারণ হিসেবে দেখেছেন,দুর্খায়েম সেখানে শ্রমবিভাগকে সমাজসদস্যদের মধ্যে পাবস্পরিক নির্ভরশীলতা ও ঐক্যবিধানকারী শক্তি হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন।* দুর্খায়েমের মতে, শ্রমবিভাগই সমাজসংহতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। তার মতে উত্তম জিনিস ও উত্তম সেবাদানের জন্যই মানুষের প্রয়োজন বিশেষীকরণের এবং এজন্যই প্রয়োজন সহযোগিতার। তবে দুর্খায়েম একথাও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন যে শ্রমবিভাগের দ্বারা উদ্ভূত পেশাগত বিশেষীকরণ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, দক্ষতা, দ্রব্য বা সেবার বিনিময়ব্যবস্থা সমাজসংহতির পক্ষে যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন হ'ল শিল্পসমাজের জন্য উপযুক্ত নিয়মকানুন, নতুন মূল্যবোধ ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, নতুন ধরনের মূল্যব্যবস্থা (moral system) সংক্ষেপে সাংস্কৃতিক বা জীবনধারাগত ব্যবস্থা যা মানুষের সঙ্গে মানুষের সহযোগিতা ও সম্পর্কের সূত্র নির্ধারণ করে দেয়। দ্রব্য ওসেবার বিনিময় শুধুমাত্র আত্মপরতার বা স্বার্থের ওপর নির্ভর করতে পারে না, কারণ যেখানে আত্মস্বার্থই মুখ্য, সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সংগ্রামেই লিপ্ত হবে (man will be at war with one another)। তাই সংগ্রামের ক্ষেত্রকে প্রশমিত করার জন্য শিল্পসমাজে চুক্তির ব্যবস্থা (system of contracts) প্রবর্তন করা হয়েছে। দুর্খায়েমের মতে, চুক্তির মাধ্যমেই এবং তাকে ভিত্তি করেই নানা ধরনের নিয়মকানুন ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। *চুক্তিকে দুর্খায়েম 'বিনিময়ের নৈতিক নিয়ন্ত্রণ' হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যে, চুক্তি হল কতকগুলো সাধারণ আইনগত কাঠামো, কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়, কোনটা কাম্য, কোনটা অকাম্য, কোনটা সঠিক, বৈধ ও যুক্তিগ্রাহ্য সে সম্পর্কে অভিন্ন ও সকলের গ্রহণযোগ্য অবশ্য পালনীয় নিয়ম।* কিন্তু চুক্তি পুঁজিবাদী/ শিল্পসমাজের শুরু মাত্র; এটা ব্যবসায় ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু শিল্পসমাজ তো শুধুমাত্র ব্যবসায়ভিত্তিকসমাজ নয়; এরও রয়েছে আর্থনীতিক অতিরিক্ত নানা বিষয়। সেকারণে চুক্তি এই ব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি হতে পারে না। তাছাড়া এই সমাজে সমষ্টিগত চেতনা তার বিষয়ের দিক থেকে ধীরে ধীরে ধর্মমুক্ত বৌদ্ধিক চেতনার রূপ ধরে এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে (individuation); পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় 'ব্যক্তিতা'কে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া হতে থাকে। মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের *The Holy Family* তে এ বিষয়টির আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষ হ'ল সমাজের একক, ব্যক্তি যেন সমাজ-

নিরপেক্ষ এক একটি এটম। নানা ব্যক্তির সমন্বয়েই সমাজ। তাঁরা লিখেছেনঃ

> The members of the civil society are not atoms. The specific property of the atom is that it has no properties and is therefore not connected with beings outside its own natural necessity The atom has no need, it is self-sufficient; the world outside it is absolute vaccum, ie it is contentless, senseless, meaningless, just because the atom has all its fullness in itself. The egoistic individual in civil society may in his non-sensuous imagination and lifeless abstraction inflate himself to the side of an atom,ie, to an unrelated self-sufficient, wantless absolutly full blessed being.

কিন্তু দুর্খায়েম বলেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভব হলেও সমষ্টিগত চেতনা ধ্বংস হয়ে যায় না। ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা শ্রমবিভাগ শাসিত সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কিন্তু তিনি জোর দিয়ে বলেন এই ব্যক্তিতা বা পৃথকীকরণ মানুষ থেকে মানুষকে, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিকে পৃথক করে না, তাদের সহযোগী, আত্মশৃঙ্খলাপরায়ণ ও নির্ভরশীল করে তোলে। শ্রমবিভাগ শাসিত শিল্পসমাজে মানুষ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। *তারা পুরোপুরিভাবে আত্মকেন্দ্রিক বা আত্মসুখবাদী হতে পারে না, সকলের সাথে প্রত্যেকের সমন্বয় এই সমাজের সংরক্ষণের পক্ষে অপরিহার্য।* দুর্খায়েম বলেন ঃ

> Division of labour leads to integration.

তিনি আরো মন্তব্য করেছেন ঃ

> We erect a cult in behalf of personal dignity, which as every strong cult already has its superstition. It is thus, if one wishes a common cult.

মানুষ ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করলেও ব্যক্তিত্ব 'cult' তৈরী হয়ে গেলেও তা হ'ল সকলের চিন্তার ভাবনারই ফসল ও সেই অর্থে ব্যক্তিগত হয়েও তা সামাজিক। এজন্য শিল্পসমাজ ভেঙ্গে পড়ছে না; সামগ্রিকভাবে একটা সংহতি রক্ষিত হচ্ছে। অত্যাচারমূলক নিয়মকানুনের পরিবর্তে সহযোগিতামূলক আইন প্রবর্তিত হচ্ছে।

> The relation governed by cooperative law with a restitutive sanction and solidarity which they expressed result from the division of labour.

তাছাড়া, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাভাবনা যাতে কোন একজন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাচারী বা স্বৈরাচারী করে গড়ে তুলতে না পারে তার জন্য সামাজিক চাপের (Social pressures) ব্যবস্থা আছে, নৈতিক নিয়ন্ত্রণ আছে: *শ্রমবিভাগ যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিকাশ ঘটায়, তেমনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে নিয়ন্ত্রণ করে।* দুর্খায়েরেম কথায় ঃ

> Individualism was a moral duty forced upon the individuals through the division of labour.

সুতরং দুর্খায়েম সিদ্ধান্ত টানেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না, তাকে অবিচ্ছিন্ন করতে সাহায্য করে; কর্তৃত্বমূলক যান্ত্রিক সংহতির পরিবর্তে সহযোগিতামূলক জৈব সংহতি রক্ষা করে। শ্রমবিভাগই মানুষের মধ্যে এই সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

দুর্খায়েম আধুনিক সমাজব্যবস্থার (পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা) শুধু একটা দিক শ্রমবিভাগের দিকটিই আলোচনা ও বিশ্লেষণ কবেছেন; সমগ্র সমাজব্যবস্থার মধ্যে এটাকেই তিনি কেন্দ্রীয় শক্তি (Central Force) হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন কিন্তু শ্রম ও মূলধনের দ্বন্দ্ব, শ্রমের বাধ্যকরণের রূপ, শ্রমিক শোষণ, উদ্বৃত্ত মূল্যের মাধ্যমে কিভাবে ধনিক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করে ইত্যাদি ধনতান্ত্রিক সামাজিক তথ্যকে (social facts) গুরুত্ব দেন নি। সমাজের অর্থনৈতিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের বাস্তবতা তিনি দেখতে পান নি; বা পেলেও তার সামগ্রিক ব্যাখ্যা করতে চাননি। Division of Labour গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তিনি আধুনিক শিল্পসমাজের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। কিন্তু সেখানে তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শ্রেণীচরিত্র, শোষণমূলক ও অত্যাচারমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংকটকে মূল কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা না করে 'বিভিন্ন শ্রেণীর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের অভাবকেই' বড় করে দেখালেন। ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই সমাজে যে ঐক্য বিরাজ করছে তার ওপর জোর দিলেন। পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হয়ে এই সমাজব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছে সে কথা বললেন কিন্তু এই ব্যবস্থা যে প্রায় চিরকালীন রূপ গ্রহণ করেছে সেই কথাই বললেন। শ্রমবিভাগের নেতিবাচক দিকগুলির উল্লেখ করেও তিনি বললেন যে শ্রমবিভাগই আধুনিক সমাজকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে রেখেছে। অন্যভাষায়, কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করলেও শ্রমবিভাগই সংহতি রক্ষা করে চলেছে। আধুনিক সমাজের এটাই হল অন্যতম 'সামাজিক তথ্য'। শ্রমবিভাগকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সম্পর্ক হিসেবে না দেখে তাকে 'শ্রেণীনিরপেক্ষতার' সঙ্গে যুক্ত করে নিয়ে ব্যাখ্যা করলেন। সমাজসংহতিকে তিনি সবথেকে উচ্চতম নৈতিক নীতি বলে মনে করেন, 'সর্ব শ্রেষ্ঠ মুল্য' বলে মনে করেন, সমাজের সব সদস্যের মান্য নীতি বলে মনে করেন। যেহেতু সকলেই জনশৃঙ্খলা, সংহতি সামগ্রিক সমন্বয়কে নৈতিক আদর্শ বলে মনে করে, সেহেতু শ্রমবিভাগও নৈতিক ধারণা। সুতরাং এই নৈতিব ধারণাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। আসলে দুর্খায়েমের সামাজিক চিন্তাভাবনা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সংরক্ষণে নিয়োজিত তাই তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চৌহদ্দির বাইরে যেতে পারেন নি।

শ্রমবিভাগের উৎপত্তির প্রকৃত কারণও তিনি উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন; তাঁর মতে শ্রমবিভাগের কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধি যে শ্রমবিভাগের আসল কারণ নয় তা সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে। এর মূল কারণ এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অপর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে রূপান্তর। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি। সামগ্রিকভাবে তিনি ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করেন না; সামাজিক তথ্য বা ঘটনার ক্ষেত্রে কোন একটি কারণ থাকে না; সামাজিক ঘটনার ক্ষেত্রে নৈতিক কারণের থেকেও অর্থনৈতিক কারণ বেশী গুরুত্বপূর্ণ; সামাজিক শ্রমবিভাগ বিষয়টির নৈতিক রূপ থাকতে পারে এবং আছেও কিন্তু অর্থনীতি এর মূল বিষয়। আসলে দুর্খায়েমের ত্রুটি হল তিনি ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করেন না; সামাজিক ব্যবস্থা যে নানা বিষয়ের বর্ণময়, বহুমাত্রিক আন্তঃপ্রক্রিয়ার বিষয় সে কথা তিনি ভুলে যান। পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপের 'পরিদৃশ্যমান', যা চোখের সামনে আসে, তারই বিশ্লেষণ করেন, তার পিছনেও যে গভীর

কারণ থাকে, তার বিশ্লেষণ করেন না। সামাজিক ব্যবস্থাকে বুঝতে গেলে, তার সঠিক বিশ্লেষণ করতে গেলে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিন্যাসকে সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, এ বিষয়টি ভুলে যান। তাছাড়া দুর্খায়েম শ্রমবিভাগকে কারণ এবং অপরাপর বিষয়কে যেমন সামাজিক জৈব সংহতিকে কার্য হিসেবে দেখেছেন। এভাবে দেখতে গিয়ে তার শ্রমবিভাগ তত্ত্ব আলোচনা হয়ে পড়েছে সংকীর্ণ এবং অনেকটাই বাস্তববর্জিত; তাঁর নিজস্ব ধারণা কাঠামো দ্বারা তা কমবেশী প্রভাবিত। যদি তিনি মার্ক্সের মত শ্রমবিভাগকে 'অর্থনৈতিক ব্যবস্থার' ফল হিসেবে দেখতেন তাহলে তাঁর আলোচনা সঠিক হতে পারতো। Ossipova সঠিক ভাবেই বলেছেন ঃ

> He therefore faild to give a properly casual explanation of the division of labour He only touched on the interaction of the different factors within the limits of social spheres without rising to the level at which the true causes of the division of labour could only be found

সমাজের বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সম্পর্কই শ্রমবিভাগকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে, মার্ক্স তা করেছেন *The Poverty of Philosophy, Grundrisse* এবং *Capital* এ। দুর্খায়েমের পক্ষে এটা করা সম্ভবও ছিল না কারণ তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন বুর্জোয়া ব্যবস্থার সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার তাত্ত্বিক সমাজতাত্ত্বিক। তবে, তাঁর কৃতিত্ব নেই, এটা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শ্রমবিভাগকে তিনি সামাজিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: *সামাজিক বিষয়কে সামাজিকভাবে ব্যাখ্যা করার মধ্যেই* তাঁর কৃতিত্ব। তাছাড়া তিনি শ্রমবিভাগের ক্ষতিকারক ওনেতিবাচক প্রভাবগুলো সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং এই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি উল্লেখ করেছেন (পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হচ্ছে)।

শ্রমবিভাগ সম্পর্কে দুর্খায়েমের তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে আমরা নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো লক্ষ্য করেছি ঃ (ক) শ্রমবিভাগের উৎস; (খ) শ্রমবিভাগের উপাদান; (গ) বিশেষীকরণ ও প্রতিযোগিতা; (ঘ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিকাশ; (ঙ) অত্যাচারমূলক আইনের পরিবর্তে সহযোগিতামূলক আইনের প্রবর্তন; (চ) নৈতিক চাপ; (ছ) যান্ত্রিক ও জৈব সংহতি।

আত্মহননতত্ত্ব — সমাজতত্ত্বে এক অসামান্য বিপ্লব

অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অর্ন্তগত রক্তের ভিতরে
খেলা করে
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত — ক্লান্ত করে;
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নেই;
তাই লাসকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের' পরে।

—জীবননান্দ দাশ

সামাজিক ঘটনা হিসেবে আত্মহননের সমস্যাকে দুর্খায়েম সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর *Le Suicide* গ্রন্থটি তত্ত্বগত ও অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক গবেষণার সমন্বয়ে এক মহান গ্রন্থ। এখানেই তিনি সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা এবং সমাজতত্ত্বকে প্রকৃত বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক অসামান্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন, যেমন অনেকটাই করেছিলেন তাঁর *Division of Labour* গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি সামাজিক ঘটনাসমূহের আধিবিদ্যক চিন্তাভাবনা বর্জন করে সমাজতত্ত্ব বিকাশের সম্ভাবনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, সামাজিক ঘটনার নিয়ম আবিষ্কারে যত্নশীল হয়েছেন, সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করে আত্মহননকে একটা সামাজিক ঘটনা হিসেবে একটা বস্তু হিসেবে অর্থাৎ ব্যক্তিনিরপেক্ষ বা 'ব্যক্তি - অতিরিক্ত' সামাজিক বিষয় বলে চিহ্নিত করেছেন। আত্মহনন ব্যক্তিই করে, কিন্তু আত্মহননের কারণ সামাজিক এবং আত্মহনন সেই অর্থেই ব্যক্তিক নয়; এটা এমন এক সামাজিক বাস্তবতা যার উৎস সমাজ নিজেই।

আত্মহনন প্রসঙ্গে দুর্খায়েম পূর্ববর্তী লেখকগণ সামাজিক কারণকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন নি কিন্তু গুরুত্ব দিয়েছিলেন ব্যক্তিগত মানসিক গঠন, জাতি ও মনস্তাত্ত্বিক কারণের ওপর। দুর্খায়েম তাঁর গ্রন্থের প্রথমেই আত্মহননের অ-সামাজিক কারণগুলোর সমালোচনা করেছেন। মনস্তাত্ত্বিক, জীববিদ্যাগত, জননবিদ্যাগত ও জলবায়ুকেন্দ্রিক মতামতগুলোকে তিনি সমালোচনা করে বলেছেন, এই মতবাদগুলোর প্রত্যেকটিই সামাজিক কারণগুলোকে অস্বীকার করেছে। প্রকৃতপক্ষে আত্মহননের কারণ হ'ল সামাজিক।

আত্মহনন ব্যক্তি-বর্হিভূত কারণের ওপর নির্ভর করে, ব্যক্তির ব্যক্তিগত গুণাবলী বা 'অভ্যন্তরীণ ধর্মের' প্রকাশ বলে একে মেনে নেয়া যায় না। সামাজিক অবস্থাই ব্যক্তিকে প্রভাবিত

করে। সামাজ-বহির্ভূত কারণ যেমন জলবায়ু, বংশধারা, মানসিক রোগ, কুলগত বৈশিষ্ট্য আত্মহননের কারণ হতে পারে না। তিনি বলেন ঃ *আত্মহনন ব্যক্তিরাই করে, সেই অর্থে ব্যক্তিনিরপেক্ষ আত্মহননের ধারণা অসম্ভব, কিন্তু তা সামাজিক অবস্থা বা সামাজিক কাঠামো দ্বারা প্রভাবিত।*

সামাজিক সংকটের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে দুর্খায়েম উল্লেখ করেছেন যে **আত্মহনন হল সমাজের সমষ্টিগত অসুখের ফল; সমাজের অসুখই ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়।** এভাবে দেখলেই আত্মহননের প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে দুর্খায়েম মত প্রকাশ করেছেন। সামাজিক অসুখের কারণ নির্ধারণ করা এবং এই অসুখের নিরাকরণ কিভাবে করা যাবে তা বিশ্লেষণ করতে গিয়েই দুর্খায়েম সমাজতত্ত্বকে ফলিত বিজ্ঞান (applied science) হিসেবেও গড়ে তুলেছেন। ব্যক্তির কার্যকলাপের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করে তিনি সেইসব শক্তি ও উপাদানসমূহের উল্লেখ করেছেন যা ঐক্যবদ্ধ করে, সংঘবদ্ধ করে, মানুষের সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা আনে। এই কারণেই তিনি সামাজিক অবস্থার অধঃপতন, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক বিশৃঙ্খলা বা বি-সংগঠন, বিচ্ছিন্নকরণ বা মূল্যবোধজনিত সংকটকে আত্মহননের প্রকৃত কারণ হিসেবে দেখেছেন। সংক্ষেপে, *সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে নেতিবাচক উপাদানই আত্মহননের প্রকৃত কারণ।*

সমাজতাত্ত্বিকতাই সমাজ, সামাজিক তথ্য বা ঘটনা ব্যাখ্যার মূল সূত্র বা নির্যাস; অন্যসব কারণগুলোকে এই সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার আলোকেই দেখতে হবে। এমনকি ব্যক্তির 'নিজস্ব আত্মহনন প্রবণতা'কেও এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। অর্থাৎ *ব্যক্তি নয়, সমাজই আত্মহননের জন্য দায়ী।* তবে দুর্খায়েম আত্মহনন কর্মপ্রক্রিয়ার পেছনে ব্যক্তিগত মানসিক গঠন কিংবা নিজস্ব জীবন প্রণালীকে একেবারে অস্বীকার করেন নি। কিন্তু এটাই গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে ব্যক্তির নিজস্ব জীবন পদ্ধতিকে ব্যক্তিগত মনে করলেও আসলে তা সাধারণ সামাজিক শর্ত বা অবস্থারই প্রতিফলন। ব্যক্তিগত কারণ আত্মহননের ক্ষেত্রেও যে প্রভাব ফেলে (কখনো কখনো তা ফেলতে পারে) তা প্রান্তিক। আত্মহনন কর্মপ্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সামাজিক পরিবেশ বা প্রতিবেশের (Social millieu) ওপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। দুর্খায়েমের পদ্ধতির সঙ্গে মার্ক্সের পদ্ধতির মিল লক্ষ্য করা যায়: ব্যক্তির নানা ধরনের কর্মপ্রক্রিয়ার উল্লেখ করতে গিয়ে মার্ক্স 'সামাজিক অবস্থার' ওপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

আত্মহননের মাত্রা এবং তার পরিধি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দুর্খায়েম নানা ধরনের সামাজিক নির্ধারক বা কারকের (social determinants or variables) উল্লেখ করেছেন। ধর্ম, পরিবার, রাজনৈতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি এবং অন্যান্য গোষ্ঠীমূলক বৈশিষ্ট্যকে আত্মহননের কারণ বলে চিহ্নিত করেন। এটা করতে গিয়ে তিনি অন্যান্য কারণগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাদের বাতিল করেছেন। যেমন তিনি ব্যক্তির নিজস্ব মনস্তত্ত্বগত প্রলক্ষণ, জাতিগত ও বংশানুক্রমিক কারণ, ভৌতিক পরিবেশ, যেমন জলবায়ু, ঋতু এবং অনুকরণ প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাদের পুরোপুরি বর্জন না করে দ্বিতীয় শ্রেণীর বা সহযোগী কারণ (attendent causes) বলে বর্ণনা করেছেন। সামাজিক কারণের অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অ-সামাজিক (Non-Social) কারণের উল্লেখ করে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। আত্মহননের বিষয়টিকে তিনি সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন

সামাজিক কারণের ওপর।

ভাষান্তরে বলা যায়, আত্মহনন হ'ল সামাজিক ঘটনা বা তথ্য; অন্যান্য বিভিন্ন সামাজিক ঘটনার সাথে তাকে যুক্ত করেই তার বাস্তব ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মহননকে ব্যক্তিবর্গের নিজস্ব 'ধরন ধারণের' প্রকাশ হিসেবে দেখলে চলবে না; একে দেখতে হবে সামাজিক ব্যবস্থার ধাঁচযুক্ত প্রপঞ্চ (patterned phenomenon) হিসেবে। দুর্খায়েম লিখেছেন ঃ

> The suicides committed in a given society during a given period of time are taken as a whole ... this total is not simply a sum of independent units, a collective total, but is itself a new fact sui generis, with its own unity, individual and consequently its own nature.

দুর্খায়েম আত্মহননের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আরও উল্লেখ করেছেন, একটা নির্দিষ্ট সমাজে আত্মহননের সংখ্যা মোটামুটি স্থির থাকে এবং এ থেকেই সিদ্ধান্ত টানা যায় যে আত্মহনন একটা সামাজিক ঘটনা যদিও মাঝে মাঝে আত্মহননের সংখ্যার তারতম্য ঘটতে পারে। এই তারতম্যের কারণও অবশ্য সামাজিক প্রভাব। আত্মহননের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে সামাজিক সংগঠনের মধ্যে। তিন লিখেছেন ঃ

> The relations of suicide to certain states of social environment are as direct and constant as the relations to facts of biological and physical character were seen to be uncertain and ambiguous.

দুর্খায়েম তার আত্মহননের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সরকারী পরিসংখ্যান ব্যবহার করে আত্মহননের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ধাঁচ বা প্যাটার্ন আবিষ্কার করেছেন ঃ

১) শীতকাল থেকে গ্রীষ্মকালে বেশী আত্মহনন ঘটে;
২) পুরুষেরা মেয়েদের থেকে বেশী আত্মহনন করে;
৩) যুবকদের থেকে বৃদ্ধদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশী;
৪) সাধারণ নাগরিক থেকে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বেশী আত্মহননের প্রবণতা দেখা দেয়;
৫) বিবাহিত ব্যক্তির থেকে অবিবাহিত এবং বিধবা/বিপত্নীকদের মধ্যে আত্মহননের প্রবণতা বেশী;
৬) সন্তানহীন পিতামাতাদের মধ্যে আত্মহননের প্রবণতা বেশী লক্ষ্য করা যায়;
৭) গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে বেশী আত্মহনন ঘটে;
৮) ক্যাথলিকদের থেকে প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে আত্মহননের প্রবণতা বেশী থাকে।

বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মানসজাত কারণ অপেক্ষা দুর্খায়েম ধর্মনৈতিক, রাজনৈতিক, পেশাগত প্রভৃতির সামাজিক অবস্থানের (Social milliuex) গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী। তিনি বলেছেন ঃ

> There is therefore for each people a collective force of a definite amount of energy impelling man to self-destruction.

সুতরাং ব্যক্তি তার নিজের ইচ্ছায় আত্মহননের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না, সমষ্টিগত শক্তি বা সামাজিক নানা চাপের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সে আত্মধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দুর্খায়েমের

এই সামান্যীকরণের সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য বা সামাজিক কারণ কী? কেন ক্যাথলিকদের মধ্যে আত্মহননের প্রবণতা কম দেখা যায়, কেনই বা প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে বেশী? কেনই বা বিবাহিত ব্যক্তিদের থেকে অবিবাহিত ব্যক্তিবা বেশী মাত্রায় আত্মহনন করে?

দুর্খায়েম বলেন ধর্মীয় বিশ্বাস আত্মহননের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। ক্যাথলিকদের এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাসকাঠামো ও আচারগত কাঠমো (belief system and ritual system) কেন্দ্রিক পার্থক্যের কারণেই আত্মহননের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট উভয় ধর্মই আত্মহননকে নিষেধ করে। ক্যাথলিকদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আচার অনুষ্ঠানের স্থান বেশী; ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীনতার স্থান কম;নতুন ধরনের চিন্তা ভাবনার প্রতি এক ধরনের অনীহা সেখানে লক্ষ্মণীয়। ধর্মীয় বিধিবিধান মান্য করার ক্ষেত্রে ক্যাথলিক গীর্জা সদস্যবৃন্দকে আদেশ নির্দেশ দিয়ে থাকে এবং সদস্যবৃন্দরা বেশীর ভাগ সময়ই তা মান্য করে। ফলস্বরূপ, ক্যাথলিকদের মধ্যে সামাজিক ঐক্যবোধ ও সংহতি বেশী লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় মেলামেশার স্থানও এখানে বেশী। সকলের সাথে সকলে এক আন্তরিক ঐক্যবোধ অনুভব করে। এর ফলে, ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা আত্মহনন প্রবনতায় কম ভোগে। অপরদিকে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মে সাবেকী বা সনাতনী বিশ্বাস কাঠামোর ওপর ততটা গুরুত্ব দেয়া হয় না। আচার অনুষ্ঠানের প্রাধান্য স্বীকৃত নয়। সমষ্টির থেকে ব্যক্তির ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে; ব্যক্তির বিবেকের ওপরই সবকিছু নির্ভর; ধর্ম এখানে যতটা সামাজিক তার চেয়ে বেশী ব্যক্তিগত। স্বাধীনতা ও সমালোচনামূলক স্বাধীন চিন্তার প্রভাবে ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর (এখানে ধর্মীয় গোষ্ঠী) সঙ্গে খুব একটা গভীর সম্পর্কের সেতু রচনা করতে পারে না। সুতরাং সব কিছুই ঢিলেঢালা, বিচ্ছিন্ন ধরনের। গীর্জা বা পোপের বা পুরোহিতের ভূমিকা এখানে অপেক্ষাকৃত কম। সমাজসংহতির ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায় কোন ঐক্যবোধ দ্বারা পরিচালিত নয়। বিশ্বাসীদের মধ্যে ঐক্যবিধানকারী শক্তির অভাবে প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে বেশী মাত্রায় আত্মহনন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দুর্খায়েম বলতে চান, *ব্যক্তির প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়ার কারণেই প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে আত্মহননের প্রবণতা বেশী।*

সামাজিক কারণের সঙ্গে সমাজসমগ্রের সঙ্গে ব্যক্তির বন্ধনের মাত্রাও বিরাট ভূমিকা পালন করে। পরিবার, সন্তানসন্ততি, কিংবা গ্রাম্য জীবন সামাজিক ঐক্যবিধানকারী শক্তি হিসেবে কাজ করে। সমাজের সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তির বন্ধন যত দৃঢ় হয়, ততই সে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা থেকে মক্ত হয়। গোষ্ঠীর প্রতি, সমাজসমগ্রের প্রতি ব্যক্তি কিভাবে এবং কতখানি সংহতি বোধ করে, সমাজের নিয়মকানুন মেনে চলে তার ওপরে আত্মহননের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। যেখানে অবিবাহিত ব্যক্তির সংখ্যা বেশী সেখানে আত্মহননের প্রবৃত্তি বা প্রবণতা বেশী। দুর্খায়েমের বিশ্বাস, বিবাহ এবং পরিবার গঠন ব্যক্তির আত্মহননের প্রবণতা অনেকটা দূর করতে পারে। সতরাং ব্যক্তিগত প্রলক্ষণের চেয়ে সামাজিক অবস্থাই আত্মহননের মাত্রা নির্ধারণ করে। 'ব্যক্তিগত ধর্ম' আত্মহননের ক্ষেত্রে প্রান্তিক বা পরোক্ষ প্রভাব ফেলতে পারে। নারী পুরুষের লিঙ্গ ভেদের কথা দুর্খায়েম বলেছেন কিন্তু নারীপুরুষের সামাজিক মর্যাদা, তাদের অবস্থান কেন্দ্রিক পার্থক্য এবং সামাজিক কর্মে তাদের অংশগ্রহণের পার্থক্যও আত্মহননের মাত্রাকে কমবেশী প্রভাবিত করতে পারে। অর্থাৎ দুর্খায়েম বলতে চান শহর বা গ্রাম, বিবাহিত বা অবিবাহিত, নারী বা পুরুষ প্রভৃতি ভেদের থেকে সামাজিক অবস্থাই গুরুত্বপূর্ণ: সামাজিক অবস্থা বা পরিবেশ দিয়েই ব্যক্তির কার্যাবলীর

ব্যাখ্য করতে হবে। আত্মহনন কোন ব্যতিক্রমী বিষয় নয়। দুর্খায়েম বলেছেন, পারিবারিক ব্যবস্থার সুসমন্বিত ঐক্য আত্মহনন প্রক্রিয়াকে অনেকটাই সীমিত করতে পারে, এমনকি আত্মহনন বিষয়টাকে অনুপস্থিত করে তুলতে পারে। দুর্খায়েম লিখেছেন ঃ

Family is a counteragent against suicide.

আবার সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে দারিদ্রক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ আত্মহনন বেশী করে। দুর্খায়েম এমতের বিরোধিতা করে বলেন যে যারা দুঃখকষ্টের মধ্যে জীবন কাটায় তাদের মধ্যে আত্মহনন প্রবৃত্তি কম। জীবনের দায়দায়িত্ব পালন ও দুঃখবরণের মধ্য দিয়ে তারা জীবনকে প্রকৃতপক্ষে উপভোগ করে, জীবনের দুঃখকষ্ট তাদের এত বেশী এবং উদয়াস্ত এত বেশী পরিশ্রম যে আত্মহননের সম্পর্কে তারা চিন্তা করারও সময় পায় না, আত্মহনন তো দূরের কথা। পক্ষান্তরে ধনী পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আত্মহননের প্রবণতা বেশী কারণ সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা ও অসন্তোষবোধ তাদের আত্মহননে উদ্বুদ্ধ করে, প্ররোচিত করে। অর্থাৎ দুর্খায়েম বলতে চান যে কিছুটা দুঃখকষ্ট মানুষের জীবনে থাকলে আত্মহনন প্রবৃত্তি কম হওয়ার সম্ভাবনা।

আমরা উল্লেখ করেছি যে সন্তানহীন পরিবারে আত্মহনন প্রবৃত্তি বেশী কারণ সেখানে নিঃসঙ্গতাবোধ বেশী। পিতামাতারা জীবনের অর্থ খুজে পায় না। ফলে আত্মহননের প্রবৃত্তি এইসব পিতামাতার মধ্যে বেশী দেখা যায়। যে সব পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেশী, সন্তানের সংখ্যা বেশী সেখানে আত্মহননের প্রবৃত্তি কম। যে পরিবারে একটিমাত্র সন্তান সেখানে প্রকৃত সামাজিকীকরণ ঘটে না সকলের সম্পর্কে কোন চিন্তাভাবনা গড়ে ওঠে না, কোনটা করতে হবে, কোনটা করা উচিত নয়, কোনটা একা ভোগ করতে হবে, কোনটা সকলে মিলে ভোগ করতে হবে, কখন মাথা নত করতে হবে, কখন উচু হয়ে দাঁড়াতে হবে, ইত্যাদি বোধ এইসব পরিবারে গড়ে ওঠে না। ফলে ব্যক্তির আত্মস্বার্থ বৃদ্ধি পায়; ব্যক্তি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে সহ্য করতে পারে না। পরিবারের প্রতি এবং বৃহৎ সমাজের প্রতি কোন আবেগজাত সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না। পরিবারের প্রতি সংহতিবোধ তৈরী হয় না; এবং সমাজসংহতির প্রতি এইসব পবিবারের সদস্যরা উদাসীন থাকে। অতি তুচ্ছ কারণে পিতামাতাদের কেউ অথবা সন্তান আত্মহননের দিকে যেতে পারে। দুর্খায়েমের অভিমত, বড় পরিবার আত্মহননের প্রতিষেধক(remedy) হিসেবে কাজ করে।

The more the children in the family, the lower the rate of
the parents suicide.

দুর্খায়েমের এই পর্যবেক্ষণের মধ্যে কোন ভুল নেই। বাস্তবজীবন থেকে এটা সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে। বড় পরিবার একটা সমাজকাঠামোর মতো; সদস্যবৃন্দ সেখানে সংযুক্ত ও সুসংঘবদ্ধ থাকে। কাঠামোগত ঐক্য থাকে; পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য, ভালোবাসা, স্নেহ, শ্রদ্ধা থাকে: সকলের অস্তিত্ব সম্পর্কে সকলের মনে একটা চেতনা থাকে। এগুলোই পরিবার সংরক্ষণে ও সংহতিতে এবং বৃহত্তর সমাজসংহতিতে সাহায্য করে। আত্মহননের বিরুদ্ধে এক ধরনের রক্ষাকবচের কাজ করে। আবার যে মায়েদের সন্তান থাকে তারা বিধবা হলেও সন্তান পালনের দায়িত্ব ও সন্তানের প্রতি আবেগজাত আকর্ষণবশতঃ আত্মহননের পথে পা বাড়ায় না। কিন্তু সন্তান হীন রমণীদের আত্মহননের প্রবণতা বেশী দেখা যায় এই কারণে যে তাদের সন্তানাদি না থাকায় পরিবারের সঙ্গে বন্ধন আলগা হয়ে যায়, তারা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় 'হতাশায় ও বিচ্ছিন্নতায়' ভোগে।

আবার প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে, সংকটে বা বহিরাক্রমনের সময় লোকে বেশী আত্মহনন করে। দুর্খায়েম এমতের বিরোধিতা করে বলেন ঃ

> great social disturbances and popular wars rouse collective sentiments stimulate patriotisim and national faith leading to a powerful integration of the individual into his community thus reducing the rate of suicide.

আত্মহননের দুর্খায়েমকৃত তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে একথাই বলা যায় যে আত্মহননের কারণ সামাজিক এবং সামাজিক কারণও বিভিন্ন ধরনের। এই কারণগুলোকে আমরা সূত্রায়িত করতে পারি – ক) সামাজিক উপাদান; খ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অভাব; গ) মূল্যবোধ সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব; ঘ) ক্রমবর্ধমান চাহিদা; ঙ) নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়; চ) সামাজিক সংহতির অভাব।

আত্মহননের কারণের বিভিন্নতাকে ভিত্তি করে দুর্খায়েম আত্মহননের চারটি ভাগ করেছেন ঃ

১) আত্মকেন্দ্রিক আত্মহনন (Egoistic suicide);
২) পরকেন্দ্রিক বা পরার্থপর আত্মহনন (Altruistic suicide);
৩) অ্যানোমিক (বিধিশূন্যতার ফলে) আত্মহনন (Anomic suicide);
৪) ভাগ্যতাড়িত আত্মহনন (Fatalistic suicide);

১) আত্মকেন্দ্রিক আত্মহনন ঃ দুর্খায়েমের মতে যখন কোন ব্যক্তি সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন বা বিযুক্ত হয়ে পড়ে, বা অনুভব করে যে সমাজে তার স্থান নেই, সে মূল্যহীন, তখন সে আত্মধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। এই সব মানুষ সমাজ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ভাবে, সবসময়ই নিজেদের কথা চিন্তা করে, এভাবে চিন্তা করতে করতে এমন এক অবস্থায় এসে পৌছায় যে সে ভাবতে শুরু করে যে তার নিজের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে, বা তার মূল্য হারিয়ে গেছে। এমন এক আবেগজাত অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন সে আত্মহনন করে, নিজেকে ধ্বংস করে। মরণ তাকে ডাকে, বা সঠিকভাবে বললেসে মরণকে ডাকে।

সাধারণতঃ এই ধরনের মানুষেরা অতিরিক্তমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক; অপরাপর সদস্যের কথা সে ভাবে না, বা অপরেও তাদের সম্বন্ধে ভাবে না। অর্থাৎ সমাজথেকে বিচ্ছিন্নতাবোধই এই আত্মহননের মূল কারণ। সে সমাজের কাছ থেকেও যৌথ সমর্থন পায় না, অনুভব করে একাকীত্ব ও শূন্যতাবোধ; অস্তিত্বের এক ট্র্যাজিক অনুভূতির সৃষ্টি হয়; তখনি আত্মকেন্দ্রিক আত্মহনন ঘটে। চরম ব্যক্তিত্ববাদী চিন্তা, অতিরিক্ত অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এই আত্মহননের কারণ। আসলে 'অসুস্থ' সমাজই এই ধরনের আত্মহননে ব্যক্তিকে প্ররোচিত করে।

২) পরকেন্দ্রিক আত্মহনন ঃ পরকেন্দ্রিক আত্মহনন আত্মকেন্দ্রিক আত্মহননের বিপরীত। *যেখানে বিচ্ছিন্নতা বা হতাশা আত্মকেন্দ্রিক আত্মহননের কারণ,সেখানে পরকেন্দ্রিক আত্মহনন ঘটে অতিরিক্ত সমাজসংহতির ফলে।* যখন ব্যক্তির স্বার্থ দ্বারা সমাজের স্বার্থ অভিন্ন হয়ে যায়, বা সমাজের প্রতি প্রবল আনুগত্যবোধ জন্মে, তখন ব্যক্তি সমাজের বা গোষ্ঠীর সার্বিক মঙ্গলের জন্য আত্মহনন করতে পারে। একেই বলে পরকেন্দ্রিক আত্মহনন। এখানে ব্যক্তি নিজেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে ভাবে না, সমাজ বা গোষ্ঠীর জন্যই যেন তার সব চিন্তা, ভাবনা, কর্মপ্রক্রিয়া। সমাজের জন্য যেন 'সে বলিপ্রদত্ত'। 'পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ'। সমাজের জন্য কোন কিছু করতেই সে পিছু পা হয় না। আত্মকেন্দ্রিক আত্মহননের ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনের কোন অর্থ খুজে পায় না,

কিন্তু পরকেন্দ্রিক আত্মহননে ব্যক্তি যেন জীবনের মহত্তর, বৃহত্তর অর্থ খুঁজে পায়। 'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈম সুখম্' অল্পতে সুখ নেই, ভূমাতেই সুখ। দুর্খায়েমের ভাষায় ঃ

It emerges from our integration of the individual to the group.

এখানে যে ব্যক্তি আত্মহনন করছে, সে ভাবে যে সে নিজের জন্য এটা করছে না, বৃহত্তর উদ্দেশ্য ও মহত্তর মূল্যবোধ রক্ষার জন্য সে আত্মহননে অংশগ্রহন করছে। তার কাছে এটা প্রশংসার কাজ নয়; তার কাছে এটা সামাজিক বিবেক বা নৈতিক দিক থেকে উন্নততর কাজ। *এই আত্মহনন সাধারণতঃ উদ্দেশ্য বা মূল্যকেন্দ্রিক।* পার্সনস্ এই ধরনের আত্মহনন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন ঃ

Altruistic suicide is a manifestation of a conscience collective which is strong in the sense of subordinating individuals to group interests,and which has the particular content of a low valuation of individual life relative to group lives.

সামাজিক প্রথা বা অভ্যাসের তাগিদে অনেকে এ ধরনের আত্মহনন করে থাকে। স্বামীর চিতায় যখন হিন্দুরমনীরা আত্মবির্সজন করতো, কিংবা রাজস্থানী রমনীরা জহরব্রতের মাধ্যমে আত্মবির্সজন করতো, ড্যানিশ যোদ্ধাগণ যখন বৃদ্ধ বয়সে জীবন উৎসর্গ করতো, বা কেউ নিজেকে সমাজের বোঝা হিসেবে মনে করে কিংবা অনুগামীগণ বা ভৃত্যগণ নেতার বা প্রভুর জন্য আত্মহনন করে সেগুলোকে পরকেন্দ্রিক আত্মহননের পর্যায়ে ফেলা যায়।

দেশের জন্য, স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যখন কেউ আত্মহননের পথ বেছে নেয় তখনও তাকে পরকেন্দ্রিক আত্মহনন বলা যায়। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সন্ত্রাসবাদীগণ বা চরমপন্থীগণ নৈরাজ্যবাদীগণ দেশের জন্য আত্মহনন করতেন তার বহু প্রমাণ আছে। দুর্খায়েমের ভাষায় ঃ

Here the individual sacrifies himself to an internalized social imperratives; he obeys what the group ordains.

সমাজের আদর্শ বা মূল্যবোধ ধংস হয়ে যাচ্ছে বা সমাজ তার মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে যাচ্ছে এমন ঘটলেও ব্যক্তি সমাজ মঙ্গলের জন্য সামাজিক মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্যকে রক্ষার জন্য আত্মহননের পথ বেছে নিতে পারে। অর্থাৎ সমাজচেতনা বা গোষ্ঠীচেতনার প্রভাবেই ব্যক্তি এই ধরনের আত্মহনন করে; ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বকে বড় করে না দেখে সমাজকেই বড় করে দেখে। পার্সনস্ এর ভাষায় ঃ

It is a manifestation of the conscience collective in the sesse of group pressure at the expense of the claims of individuality.

৩) অ্যানোমিক আত্মহনন ঃ অ্যানোমিক আত্মহননের মূল কারণ হ'ল সামাজিক নিয়মহীনতা ও নিয়ন্ত্রণবিহীনতা। সামাজিক বিশৃঙ্খলা চরম আকার ধারণ করলে এধরনের আত্মহনন ঘটতে *দেখা যায়। এই সামাজিক বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে বলতে গিয়ে কোজার ও রেসেনবার্গ বলেছেন ঃ*

Anomique means, a condition of normlessness, a moral vacuum, the suspension of rules. a stage sometimes referred to as deregulation.

সাধারণতঃ বিরাট সামাজিক আলোড়ন বা অর্থনৈতিক সংকটের সময় যখন ব্যক্তিগণ

সামাজিক পরিবর্তন এবং নতুন প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে সমন্বয় করতে পারে না, তখন এই ধরনের আত্মহনন করে থাকে।

দুর্খায়েম বিষয়টিকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, অ্যানোমিক অবস্থাই এমন যে সেখানে কোন নিয়মের বালাই নেই, পুরোনো নিয়মকাঠামো বা মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়ে, নতুন কোন নিয়মশৃঙ্খলা বা বিশ্বাস কাঠামো বা নৈতিকতাও গড়ে ওঠে না। কবি ম্যাথ্যু আর্নল্ড এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়ঃ

One world is dead and another is powerless to be born.

এই ধরনের সামাজিক অবস্থা ব্যক্তিকে নৈতিক দিক দিয়ে অসুস্থ করে তোলে। সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে, রাজনৈতিক - সামাজিক আলোড়ন বা অর্থনৈতিক সংকটে কেউ কেউ সমাজের উচ্চশিখরে উঠে যেতে পারে, আবার সমাজের মর্যাদাশালী ব্যক্তিগণ তাদের সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে ফেলেন। দুর্খায়েম যে অবস্থার বিধিশূন্যতার ও নৈতিক অবক্ষয়ের বর্ণনা করেছেন, তার সঙ্গে কার্ল মার্ক্সের *এইটিনথ্ ব্রুমেয়ার, ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম* বা *ফ্রান্সে গৃহযদ্ধে* ফরাসী সমাজের যে বণর্না দেয়া হয়েছে কোথাও কোথাও মিল লক্ষ্য করা যায়। ১৮৪৮ সাল থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত ফরাসী সমাজে এই ভাঙ্গাগড়ার প্রক্রিয়া চলছিল। ফরাসী সমাজের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই দুর্খায়েম তাঁর অ্যানোমিক আত্মহননের তত্ত্ব রচনা করেছেন। *Le Suicide* গ্রন্থে দুর্খায়েম বলেছেন যে অর্থনীতির ওঠানামা এবং আত্মহননের মধ্যে গভীর সংযোগ আছে। তবে অর্থনৈতিক মন্দার সময়েই যে আত্মহননের মাত্রা বৃদ্ধি পায় তা নয়, অর্থনৈতিক সচ্ছলতার সময়েও অ্যানোমিক আত্মহনন হতে পারে।

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কৃষি নির্ভর সভ্যতা ভেঙ্গে পড়ার ফলে মানুষের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাত্রা কমে যায়, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাও সীমাহীন হয়ে ওঠে, নতুন অর্থনৈতিক জীবনের ওপর কোন নৈতিক শৃঙ্খলাও আরোপ করা যায় না। বিশেষত ব্যবসায়ী জগতের লোকদের মনে লোভও প্রচন্ড বৃদ্ধি পায়। মানুষ অর্থ উপার্জনের বিষয়ে হয়ে ওঠে মরিয়া ও অসহিষ্ণু। অনন্ত আকাঙ্ক্ষার দ্বারা (unweening ambition) মানুষ আক্রান্ত হয়ে পড়ে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা বাস্তবায়িত হয় না। ফলে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিদের থেকে নিজেকে অসুখী ভাবতে শুরু করে। 'কিছু হ'ল না, কিছুই হ'ল না' এমনি এক মানসিক অস্থিরতার মধ্যে তারা কাল কাটায়। যারা সব থেকে ধনী তাদের মধ্যেই এই প্রবণতা বেশী; কাম্য পর্দমযাদা বা অর্থোপার্জন করতে না পারার কারণে অনেকে আত্মহনন করে। সংক্ষেপে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতা বা অনুপস্থিতি এবং বিশৃঙ্খলা ও ভেঙ্গে পড়া অনিয়ন্ত্রিত মানবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই থাকে অ্যানোমিক আত্মহননের বীজ। সমাজ যখন সামগ্রিকভাবে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ করতে অপারগ তার ফল যে অপরিহার্যভাবে মর্মান্তিক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৪) ভাগ্যতাড়িত আত্মহনন ঃ অ্যানোমিক আত্মহননের বিপরীত হল এই ধরনের আত্মহনন। এই ধরনের আত্মহননের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন কোন গোষ্ঠী বা বৃহত্তর অর্থে সমাজ ব্যক্তির ওপর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, কঠোর নিয়মকানুন মেনে চলতে নির্দেশ দেয় বা ব্যক্তির স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যকে ধ্বংস করে, তখন ব্যক্তি এগুলোবে অসহনীয় মনে করে, নিজেকে সমাজ বা গোষ্ঠীজীবনের সঙ্গে সমাযোজিত করতে না পেরে আত্মহননের দিকে অগ্রসর হয়। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে কোন ব্যক্তির ওপর অযথা

কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, নানা রকম বাধানিষেধ আরোপ করে তার ভবিষ্যতের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। অর্থাৎ অত্যাচারমূলক শৃঙ্খলার শিকার হয়ে অনেকে এই ধরনের আত্মহনন করে থাকে। বিভিন্ন দেশের সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই ধরনের আত্মহননের উদাহরণ পাওয়া যায়। ভারতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অত্যাচারমূলক শৃঙ্খলার শিকার হয়ে অনেকেই এই ধরনের আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

আত্মহননের তাত্ত্বিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সমাজতত্ত্বে দুর্খায়েমের অসামান্য সাধন সাফল্য বলে চিহ্নিত। *Le Suicide* গ্রন্থটি এক হিসেবে সমাজতত্ত্বকে প্রকৃত বিজ্ঞান হিসেবে তৈরী করার এক সার্থক প্রয়াস। ধর্মীয় বিষয় আলোচনার সময় দুর্খায়েম কিছুটা আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু এখানে যথেষ্ট বিষয়নিষ্ঠতার সঙ্গে আত্মহননের সামাজিক কারণের অনুসন্ধান করেছেন। তার আত্মহনন বিশ্লেষণের মধ্যে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে আত্মহননের সামাজিক ভিত্তি হ'ল ধনতান্ত্রিক সমাজের সংকটজনক অবস্থা। বিশেষ করে, অ্যানোমিক আত্মহনন যে ধনতান্ত্রিক সমাজের বিধিব্যবস্থার অবক্ষয় ও সীমাহীন লোভের ফল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য দুর্খায়েম সরাসরিভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দায়ী করেন নি। আত্মহননকে আধুনিককালের সমাজতাত্ত্বিক মার্টন সামাজিক বিচ্যুতিগত আচরণ হিসেবেই দেখেন নি, একে সামাজিক অবস্থার বাস্তব ফল হিসেবেও দেখেছেন। তবে দুর্খায়েম নিজেও কখনো কখনো সঠিকভাবে আত্মহননের ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। তিনি দায়ী করেছেন নৈতিক অধঃপতনকে, নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশৃঙ্খলাকে কিন্তু কেন এই বিশৃঙ্খলা, কেন এই অধঃপতন তার কারণ বিশ্লেষণ করেন নি। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃত সম্পর্ককেন্দ্রিক ব্যাখ্যা তিনি দেন নি। আবার কোন কোন সময়ে তাঁর আলোচনা হয়ে উঠেছে আনুষ্ঠানিক ও বিমূর্ত। সামাজিক কারণের অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি মাঝে মাঝে মনস্তাত্ত্বিক কারণের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া, বিভিন্ন সমাজের আর্থ-সামাজিক বিন্যাসের ওপরেও আত্মহননের বা অন্যান্য সামাজিক কর্ম নির্ভর করে একথা তিনি অস্বীকার করেছেন বা সচেতনভাবেই পাশ কাটিয়ে গেছেন। কার্ল মার্ক্স ফরাসী নথিপত্র, বিশেষ করে প্যারিসের পুলিশ মহাফেজখানার অধ্যক্ষের বিবরণ থেকে তৎকালীন আত্মহত্যা ও নানাধরনের মৃত্যু বিবরণ তুলে দেখিয়েছিলেন যে সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক কীভাবে ধ্বংস করছে ব্যক্তির স্বরূপকে। আত্মহননের পিছনে দারিদ্র একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে কিন্তু দুর্খায়েম দারিদ্রকে আত্মহননের প্রতিরোধাত্মক ভূমিকাকেই বড় করে দেখালেন। আত্মহননের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহের উল্লেখ করেছেন। তাঁর আলোচনার ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা হল এটা যে তিনি বিষয়গত ও বিষয়ীগত উপাদানের সম্পর্কের মধ্যে কোন ঐক্য গড়ে তুলতে পারেন নি।

তবে সংখ্যাতত্ত্বের বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেভাবে 'আত্মহনন কর্মপ্রবাহ'কে ব্যাখ্যা করেছেন তা সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে এক স্থায়ী সম্পদ। আধুনিককালে যেভাবে সংখ্যাতত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে সেভাবে তিনি তা করতে পারেন নি। তাছাড়া ধনতন্ত্রের মূল রোগ তিনি অনেকটাই ধরতে পেরেছিলেন কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন ফরাসী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার একজন মতাদর্শবিদ, তাই ব্যবস্থার মাধ্যমেই কিভাবে আত্মহননের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সামাজিক বিচ্যুতিকে দূর করে সামাজিক সংহতি রক্ষা করা যায় তার এক অসাধারণ বিশ্লেষণ ধারা আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন।

সামাজিক সংহতি, শ্রমবিভাগ ও বিধিশূন্যতা

'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দ্যাখে তারা!'
—জীবনানন্দ দাশ

সামাজিক সংহতি সম্পর্কে দুর্খায়েম মৌলিক ও যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তাভাবনা করেছেন এটা আমরা তাঁর শ্রমবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি। সমাজতত্ত্বে সামাজিক সংহতির ধারণা তাঁর এক বিরাট অবদান। তিনি তাঁর সামগ্রিক আলোচনার কেন্দ্রে রেখেছেন সমাজকে। ***ব্যক্তি মানুষ নিয়ে সমাজ গঠিত কিন্তু সমাজকে তিনি ব্যক্তির ওপরে স্থান দিয়েছেন। The Social Division of Labour*** গ্রন্থে সামাজিক জীবনের আলোচনা করতে গিয়ে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন।

ক) সমাজসংহতি বা সামাজিক ঐক্য;

খ) শ্রমবিভাগ;

গ) সামাজিক বিবর্তন।

এই তিনটি বিষয় স্বয়ংসম্পূর্ণ বা পৃথক পৃথক বিষয় নয়; একটি বিষয় অপর বিষয়ের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে যুক্ত। আলোচনার সুবিধের জন্য এগুলোকে আমরা স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করি। আসলে সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ই অপর বিষয়ের সাথে এক অর্ন্তজাত সম্পর্কে সম্পৃক্ত। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের সামাজিক জীবন বিভিন্ন মানুষেয় চেতনা, চিন্তা ও মনের সাদৃশ্যমূলক কর্মপ্রবাহের ফল। দুর্খায়েমের মতে, মানুষের সামাজিক জীবনকে শ্রমবিভাগ যতটা প্রচন্ডভাবে প্রভাবিত করেছে, আর কোনকিছুই তা করেনি। শ্রমবিভাগই বহুমাত্রিক সামাজিক জীবনের উৎস এবং চালিকাশক্তিও। সমাজসংহতি ও সামাজিক ঐক্য রক্ষা ও বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে দুর্খায়েম মনে করেন। শ্রমবিভাগের ব্যাপক ব্যবহার মানুষের কর্মের বিশেষীকরণ করে, কিন্তু বিশেষীকরণের অর্থ বিচ্ছেদকরণ নয়, বরং তার উল্টো। বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করে কিন্তু একের কর্ম অপরের কর্মের সাথে কোন না কোন ভাবে যুক্ত। সামাজিক কাজ যৌথ কাজ; এখানে প্রত্যেকেই তার কাজ করে কিন্তু যদি প্রত্যেকে তার কাজকে উত্তমরূপে করতে চায় তাহলে তাদের মধ্যে সংহতি ও ঐক্য রক্ষার প্রয়োজন। এই কারণেই আধুনিক শিল্পসমাজের মানুষ পরস্পরের কাছাকাছি আসে এবং নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করে। কর্মপ্রক্রিয়ার অনিবার্য ঐক্যসূত্রেই সামাজিক ঐক্য ও সমাজসংহতি রক্ষিত হয়। নতুন সমাজব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন হয় সকলের *স্বীকৃত নিয়মকাঠামো বা নীতিমালা যা সমাজসদস্যরা প্রত্যেকেই মেনে চলে, মেনে চলতে বাধ্য* হয়। এভাবেই গড়ে ওঠে সমাজসংহতির স্থির নির্দিষ্টি বিশ্বাস কাঠামো।

দুর্খায়েম সমাজ সংহতিকে দুভাগে ভাগ করেছেন ঃ

১) যান্ত্রিক সংহতি;

২) জৈব বা অন্তর্জাত সংহতি।

১) যান্ত্রিক সংহতি ঃ যে সমাজে বৈচিত্রময়তা নেই, সমাজসদস্যদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকে না, সকলে প্রায় একই পেশাভুক্ত এবং যেখানে এক ধরনের মূল্য বা চিন্তাই কার্যকরী থাকে, ভিন্ন চিন্তা বা মূল্যবোধের অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়, ব্যক্তির স্বাধীনতার পরিবর্তে গোষ্ঠী বা সমাজ প্রাধান্যই বড় হয়ে ওঠে, সেখানেই আমরা যান্ত্রিক সংহতি লক্ষ্য করি। এখানে শ্রমবিভাগ বিষয়টি প্রায় অনুপস্থিত; নরনারীর কর্মগত বিভাজন ছাড়া অন্যধরনের শ্রমবিভাগ নেই। পেশাগত বিভিন্নতা ও বিশেষীকরণও থাকে না। প্রাক-শিল্প সমাজেই এই যান্ত্রিক সংহতি লক্ষ্য করা যায়।সমরূপতাই (uniformity) সমাজসদস্যদের সম্প্রদায়গত জীবনযাপনের ভিত্তি। এখানে সমাজসংহতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন কাজ ও চিন্তাধারার ব্যাপক ঐক্যের উপর সৃষ্টি হয় না, সংহতি যেন ওপর থেকে চাপানো হয় বা প্রক্ষিপ্ত বিষয়। মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও নৈতিকক্ষেত্রে সাদৃশ্যই যান্ত্রিক সংহতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য। একই ধরনের চাহিদা, একই ধরনের জীবনযাপন পদ্ধতি ও জীবন পদ্ধতি এই সংহতির বিশেষত্ব। দুর্খায়েম তাঁর পরবর্তীকালের গবেষণাগ্রন্থ *The Elementary Forms of Religious Life* তে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যে টোটেমকেন্দ্রিক ধর্মীয় আচার আচরণ লক্ষ্য করেছিলেন তার মধ্যেও আসলে এই যান্ত্রিক সংহতিই উপস্থিত ছিল। টোটেম পুজোর মধ্যে দিয়ে তারা একধরনের সাদৃশ্যমূলক জীবনযাপন করতো। তাদের সমাজসংহতি তাই ছিল যান্ত্রিক সংহতি। যান্ত্রিক সমাজসংহতি দমনমূলক অত্যাচারমূলক আইনকানুন, বিশ্বাস ও নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজনির্দিষ্ট ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যের বাইরে কোন কিছুই এখানে সহ্য করা হয় না। বরং সামাজিক নিয়ম বর্হিভূত চিন্তা বা কর্মকে কঠোর হাতে দমন করা হয়। দুর্খায়েম Division of Labour গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> There exists a social solidarity which comes from a certain number of states, or conscience which are common to all members of the same society. This is what repressive law materially represents, at best in so far as it is a tradition.

অর্থাৎ এখানে ঐতিহ্যই বড় কথা; ব্যক্তির ব্যক্তিগত গুণ বা চিন্তার কোন স্থান নেই; ঐতিহ্য অনুসরণকরার মধ্যেই সমাজসংহতি নির্ভরশীল। ঐতিহ্যবিরোধীতা করার অর্থই হল সামাজিক সংহতির বিরোধিতা করা। সমাজসদস্যরা অনেক সময় তা করতে চায় না। দুর্খায়েমের এই যান্ত্রিক সংহতির ধারণা রবীন্দ্রনাথের ***পারিবারিক দাসত্ব*** প্রবন্ধের কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। তিনি লিখেছেন ঃ

মনুষ্যজাতি স্বভাবতই ক্ষমতার অন্ধ উপাসক। যে পক্ষে ক্ষমতা সেই পক্ষেই আমাদের সমবেদনা, আর অসহায়ের আমরা কেহ নই। এইজন্যই একজনের হাতে যথেচ্ছা ক্ষমতা থাকিলে অত্যন্ত ভয়ের বিষয়। তাহার ব্যবহারের ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার লোক সংসারে পাওয়া যায় না। কাজেই তাহাকে আরো বড়ো একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হয় না। যাহাদের বিবেচনা করিয়া চলা আবশ্যক, সংসারের গতিকেএমনি হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহাদেরই

বিবেচনা করিয়া চলিবার কম প্রবর্তনা হয়। এই গুরুজন সম্পর্কেই একবার ভাবিয়া দেখো-না। যত আইন, যত বাধাঁবাঁধি যত কড়াক্কড় সমস্তই কি কনিষ্ঠের উপরেই না? কেহ যদি নিতান্ত অসহ্য আঘাত পাইয়া গুরুজনের মুখের উপরে একটা কথা বলে, অমনি কি বড়ো বড়ো পক্ক কেশ মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে না? আর যদি কোন গুরুজন বিনা কারণে বা অন্যায় কারণে তাহার কনিষ্ঠের উপরে যথেচ্ছ ব্যবহার করে তবে তাহাতে কাহার মাথা ব্যথা হয় বল দেখি? গুরুজন মারুন, ধরুন, গালাগালি দিন, ঘরে বন্ধ করে রাখুন, তাহাতে কাহারো মনোযোগমাত্র আকর্ষণ করে না, আর কনিষ্ঠ যদি তাহার গুরুজনের অনির্দিষ্ট পথের একচুল বামে কি দক্ষিণে হেলিয়াছে গুরুজনের পান হইতে একতিল চুন খসিয়াছে , অমনি দশ দিক হইতে দশটা যমদূত আসিয়া কেহ তাহার হাত ধরে, কেহ তাহার চুল ধরে, কেহ গালাগালি দেয়, কেহ বক্তৃতা দেয়, কেহ মারে ও তাহার দেহ ও মনকে সর্বোতভাবে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাহার নিষ্কৃতি দেয়।

যান্ত্রিক সংহতির একটাই ধরণ; এখানে সবকিছুকেই মেনে চলতে হয়, প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করা গ্রাহ্য নয়। সেজন্য এই যান্ত্রিক সংহতিকেন্দ্রিক সমাজ নিস্তরঙ্গ, বদ্ধজলাশয়ের মত নিস্তব্ধ। আলোহীন, বায়ুহীন, জানালাহীন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অচলায়তন নাটকটি অধ্যয়ন করলে দেখা যায় তিনি যে বিষয়টির অবতারণা করেছেন আসলে তা সামাজিক যান্ত্রিক সংহতির অসামান্য ছবি। রবীন্দ্রনাথের এই নাটক ও তাঁর সামজিক প্রবন্ধগুলি পড়লে দুর্খায়েম প্রদত্ত যান্ত্রিক সংহতিরধারণা সমন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হবে।

কিন্তু এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে কোন সমাজই তো স্থানু বা স্থিতিশীল নয়, থাকতে পারেও না, সামাজিক বিকাশ, পরিবর্তন ও বিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কালক্রমে তাই সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক সামাজিক সংহতিতে ফাটল ধরে। এর মূল কারণ শ্রমবিভাগ। দুর্খায়েমের তাই ধারণা।

২) ***জৈব সংহতি ঃ*** যান্ত্রিক সংহতির বৈশিষ্ট্য যেমন সাদৃশ্য, জৈবসংহতির বৈশিষ্ট্য তেমন পার্থক্য, পৃথকীকরণ বা বিশেষীকরণ। উন্নত শিল্পসমাজে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম; বিস্তৃত তার কর্মের বা পেশার এলাকা; মানুষ এই সমাজে কতরকমের পেশায় নিযুক্ত, তার সীমা নেই। একটি নির্দিষ্ট কারখানাতে কতরকমের কর্ম ও পেশা। তাছাড়া বৃহত্তর সমাজে মানুষ নানা কাজে নিযুক্ত। কারখানা, অফিস, আদালত, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেসব জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন পেশা ভিত্তিক কর্ম। এছাড়া রয়েছে নানা ধরনের ব্যবসায় নিযুক্ত মানুষ। দুর্খায়েম তাই মত প্রকাশ করে বলেছেন যে শ্রমের সামাজিকীকরণ ও বিস্তৃতিকরণের ওপরই শিল্পসমাজের ক্রমান্বয়ী বিকাশশীল অস্তিত্ব নির্ভরশীল। শ্রমের এই বিস্তৃতিকরণ ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির ভূমিকা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রত্যেকেই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে, ‘ব্যক্তিত্ব’ হয়ে ওঠে। প্রয়োজন ও অভাববোধের প্রেরণায় মানুষ নানা রকম কাজে লিপ্ত হয়। একজন মানুষ আর একজন মানুষের কাছে এসে উপস্থিত হয়। কারখানার শ্রমিক তার পুত্রের শিক্ষার জন্য শিক্ষকের কাছে আসে। অর্থাৎ বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্র তৈরী হওয়াতে একদিকে যেমন পৃথকীকরণ, বিশেষীকরণ ঘটে, তেমনি তা আবার সহযোগিতার দিকে এগিয়ে চলে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক নির্ধারণ করে। এমনকি শ্রমিক মালিকের সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্বশীল সম্পর্ক প্রধান হলেও উভয়ের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে না উঠলে উৎপাদন প্রক্রিয়া চালানো সম্ভব নয়। শিল্পসমাজে শ্রমবিভাগের দরুণ

বিভিন্ন পেশা ও কর্ম অনুসারে নানা গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। অর্থনৈতিক গোষ্ঠী, পেশাগত গোষ্ঠী, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, অ-অর্থনৈতিক গোষ্ঠী, শিক্ষা সম্পর্কীয় গোষ্ঠী, সরকারী কর্মচারী গোষ্ঠী এবং আরও নানা ধরনের গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই সব গোষ্ঠীভূক্ত সদস্যের মধ্যে সচেতন বা অর্ধসচেতন এক যৌথতার সৃষ্টি হয়; নিজেদের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক বা বন্ধন গড়ে ওঠে এবং এইসব সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের নিয়মকানুন ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। সদস্যদের ওপর কোন নিয়মকানুন চাপিয়ে দেয়া হয় না; কারণ প্রত্যেকের নিজস্ব স্বাধীন মত ও মতামতের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে জৈব ঐক্য। যত বৈচিত্র সৃষ্টি হয়, তত ঐক্যবদ্ধতা বা ঐক্যের সৃষ্টি হয়। সামাজিক বন্ধন বা ঐক্য সৃষ্টি হয়। *কিন্তু তা সৃষ্টি হয় পারস্পরিক সহনশীলতা ও সহযোগিতা বা আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে; পার্থক্যের স্বীকৃতিই সেই ঐক্যের মূল ভিত্তি।* শিল্প সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলো দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মতো সমাজদেহের বিভিন্ন কাজ করে। সেজন্যই শিল্প সমাজের ঐক্য বা সংহতিকে বলা হয় জৈব ঐক্য বা সংহতি। জৈব সংহতি ব্যক্তিকে/ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করে না, বরং তাকে বিকশিত করে; নিয়মকানুন, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেয় না। আইনকানুনগুলো ও সামাজিক নিয়মগুলো দমনমূলক না হয়ে সহযোগিতামূলক হয়। *Dawn Markin Dale* সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন :

> Thus the law becomes a major index to have been most crucial of all social facts—social solidarity.

সামাজিক সংহতির উদ্দেশ্য : সামাজিক সংহতির ধারণা নতুন কিছু নয়। প্রতিটি যুগেই দার্শনিক, সামাজিক চিন্তাবিদগণ এবং ধর্মীয় গুরুগণ সামাজিক সংহতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সমাজসংহতি ও সমাজশৃঙ্খলাকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য বলে অভিহিত করেছেন। অ্যারিস্টটল, সেন্ট অগাস্টাইন, টমাস একুনাস, ফরাসী দার্শনিক বোঁদা, সমাজতাত্ত্বিক কোঁৎ, স্পেনসার এবং আধুনিক অনেক সমাজবিজ্ঞানী সমাজসংহতির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দুর্খায়েমের কৃতিত্ব হ'ল তিনি একে নতুনভাবে, নতুন শিল্পসমাজের (ধনতান্ত্রিক সমাজ) পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছেন, নতুন রূপ দিয়েছেন। প্রথমত, সামাজিক সংহতি দুর্খায়েমের সমাজতত্ত্বের অন্যতম প্রত্যয় এই কারণে যে একে কেন্দ্র করেই তিনি সামাজিক জীবনের প্রতিটি বিষয়কে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন; সামাজিক সংহতিকে সংখ্যাতত্ত্ব ও ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছেন। একে তিনি তার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার বিষয় করেছেন। দ্বিতীয়ত, সামাজিক সংহতি শুধুমাত্র বিজ্ঞান নির্ভর আলোচনাক্ষেত্র নয়; এটা সামাজিকভাবে এক প্রয়োজনীয়তাও। দুর্খায়েম সামাজিক বিষয়গুলোকে একদিকে বৈজ্ঞানিভাবে ব্যাখ্যা করেন, অপরদিকে সামাজিক জীবনে এদের প্রয়োগযোগ্যতা ও কার্যকারিতার দিকও উল্লেখ করেছেন। সামাজিক সংহতির তত্ত্ব দিতে গিয়ে তিনি সকলের উপরে সমাজের স্থান দিয়েছেন, আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। মানুষের বড় পরিচয় সে সমাজবদ্ধ মানুষ। সমাজই তার সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা, ভালমন্দ, তার আত্মবিকাশের স্থান। মানুষের পরম আশ্রয়স্থল সমাজ। সমাজের গুরুত্ব না দিলে ব্যক্তি এত বেশী গুরুত্ব পাবে যে সে সামাজিক মঙ্গলের বিষয়কে উপেক্ষা করবে; সমাজ এক নৈরাজ্যিক প্রপঞ্চের মধ্যে নিমজ্জিত হবে। দুর্খায়েম এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে সামজিক কল্যাণের মধ্যেই রয়েছে ব্যক্তির গুরুত্ব। এই প্রয়োজনীয়তার দিককে কেন্দ্রে রেখেই তাঁর সামাজিক সংহতি তত্ত্ব রচনা।

সামাজিক সংহতির বৈশিষ্ট্য ঃ দুর্খামের সামাজিক সংহতি তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

১) সামাজিক সংহতি বিষয়টি একটি নৈতিক প্রপঞ্চ। তবে এটা নৈতিক বিষয় হলেও হেগেলীয় দর্শন বা উপযোগিতাবাদী দর্শনের আলোকে একে ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। হেগেলের দর্শনে আমরা সর্বশক্তিমান 'রাষ্ট্র সমাজের' চিত্র দেখি যেখানে ব্যক্তির ভূমিকা ম্লান অথবা নেই বললেই চলে। দ্বিধাহীনভাবে ও প্রশ্নহীনভাবে 'রাষ্ট্র সমাজের' আইন মেনে চলার মধ্যেই ব্যক্তির স্বাধীনতা বা ব্যক্তিত্ব বিকাশ হতে পারে। এটাও এক ধরনের যান্ত্রিক সংহতির মতই। ব্যক্তি এখানে ব্যবস্থার হাতে ক্রীড়নক বা দাস। উপযোগিতাবাদী দর্শনে ব্যক্তির ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে; ব্যক্তিই সমাজের একক ফলে সীমাহীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদই এর ধর্ম। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই সমাজেব আলোচনা হতে পারে বলে উপযোগিতাবাদীরা মনে করেন। দুর্খায়েম মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন বিশেষীকরণ ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সামাজিক বিশ্বাস কাঠামোর সমন্বয় করতে হবে। কারণ ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সমাজ পরস্পরের সাথে যুক্ত। মূল্যবোধকেন্দ্রিক সামাজিক সংহতির ওপর দুর্খাযেম জোর দিয়েছেন। ফলে সামাজিক সংহতি একটা নৈতিক প্রপঞ্চ।

২) সামাজিক সংহতি যেহেতু একটা নৈতিক প্রপঞ্চ তাই এটার কোন ভৌতিক বা মূর্ত রূপ নেই। এটা কোন 'বস্তু' নয়; একে দেখা যায় না বা স্পর্শও করা যায় না। এটা হল সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা অবস্থা, তাই এটার প্রকৃতি বিমূর্ত। ***সংক্ষেপে বললে এটা আকারহীন।***

৩) সামাজিক সংহতি যৌথ বা সমষ্টিগত চেতনার প্রতিফলন। মানুষের সঙ্গে মানুষের আবেগজাত আকর্ষণজনিত কারণে এটার উৎপত্তি। সামাজিক সংহতির ধারণা যতটা যৌক্তিক তার থেকেও বেশী আবেগজাত। মানুষের মনে যখন সমাজ সম্পর্কে, তাদের জীবনধারণের সম্পর্কে এক ঐক্যানুভূতি জন্মে তখনই আমরা সামাজিক সংহতির বিষয়টি বুঝতে পারি। আর আবেগজাত আকর্ষণই সমাজসংহতিকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যায়।

৪) সামাজিক সংহতি স্থির হয়ে যাওয়া বা সম্পূর্ণরূপে রূপবদ্ধ হওয়া, এরকম বিষয় নয়। একটা নির্দিষ্ট পর্বে, সময়ে বা অবস্থাতে এসে এটা শেষ হয়ে যায় না। সামাজিক সংহতি পরিবর্তনশীল ধারণা কারণ সমাজ নিজেই স্থির হয়ে যাওয়া বিষয় নয়; সমাজের রূপের পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক সংহতির রূপেরও পরিবর্তন ঘটে।

৫) সামাজিক সংহতির মূল্যায়ন বা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। সামাজিক সংহতি একটা নৈতিক, বিমূর্ত এবং পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রপঞ্চ। তাই এর সামগ্রিক মূল্যায়ন ও পরিমাপ সম্ভব নয়। অনেক সময় দেখা যায় কোন সমাজে নৈতিক শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে, সামাজিক সংকট ঘনীভূত; কিন্তু হঠাৎ অপর দেশের আক্রমণের ফলে সমাজসদস্যদের মধ্যে এক আবেগজাত সম্পর্ক তৈরী হয়, সমাজের ব্যক্তিসদস্যদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এসে যায়; সবাই যেন প্রত্যাক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিতে অগ্রসর হয়। সেই মুহূর্তে নিজেদের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য অনুভব করে। পরিস্থিতিগতকারণে সামাজিক সংহতি হয়।

সামাজিক সংহতি সমাজের খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বস্তুগতভাবে পরিমাপযোগ্য না হলেও এটা অস্তিত্বশীল। সমাজসংহতির ওপরেই সমাজের এবং সমাজসদস্যদের বিকাশ নির্ভর করে,

সমাজের টিকে থাকা এবং তার পরিবর্তন নির্ভর করে। যে সমাজে সংহতির অভাব সে সমাজ অসুস্থ এবং এই অসুস্থতা সমাজসদস্যদের গ্রাস করে। সামাজিক সংহতি ব্যক্তিদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ জাগায়, মানসিক স্বস্তি দেয় এবং সমাজসংগঠনকেও উন্নত করে। মানুষের নৈতিক মানেরও উন্নতি হয়। শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, সাহস, সাফল্য প্রভৃতি সামাজিক - মানবিক গুণগুলো সামাজিক সংহতিরই অবদান। সামাজিক সংহতি সমাজকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলে এবং সামাজিক প্রগতি ত্বরান্বিত করে।

দুর্খায়েম সমাজসংহতির তাত্ত্বিক; সামাজিক শ্রমবিভাগের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দুর্খায়েম বলেছেন যে, শ্রমবিভাগের ফলে উদ্ভুত সামাজিক সংহতির মধ্যে মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খলা, বিসংগঠন বা নানা ধরনের উপপত্তি উপস্থিত হতে পারে। তিনি সঠিকভাবেই দেখিয়েছেন যে অতিরিক্ত বিশেষীকৃত সামাজিক শ্রমবিভাগের মধ্যেই সমাজসংহতিকে আঘাত করার বীজ নিহিত থাকে। দুর্খায়েম এই অবস্থাকে *'anomie'* বলে অভিহিত করেছেন। *'anomie'* র অর্থ হল বিধিশূন্যতা বা 'অনিয়ন্ত্রণ' বা 'নিয়মহীন' অবস্থা। সামাজিক সংহতি তত্ত্ব অপেক্ষা *'anomie'* র অবস্থা, বিশ্লেষণের মধ্যেই দুর্খায়েমের মৌলিক অবদান। পরবর্তীকালের বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট মার্টন তাঁর ***Social Structure and Anomie*** তে অ্যানোমি ধারণার ভিত্তিতেই আধুনিক সামাজিক সংগঠন ও তার থেকে উদ্ভুত বিধিশূন্যতা সম্পের্কে আলোচনা করেছেন। এছাড়া পার্সনস্, ব্লাউয়ার্ড, মিজরুচি, স্রোল, ওয়েন্ডেল, বেল, সাইমন, গ্যাগনন্ ম্যাকক্লোস্কি ও শচার বিধিশূন্যতার বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। কমবেশী সকলেই দুর্খায়েমের *'anomie'* ধারণাকাঠামো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

দুর্খায়েম পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে সচেতন ছিলেন; ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক ও আত্মিক বিষয়াবলী সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রম ও পুঁজির বিরোধকে প্রধান সমস্যা বলে স্বীকারও করেছেন। শ্রমবিভাগের অস্বাভাবিক রূপের সৃষ্টির মূল কারণ হল সামাজিক বিকাশের মাত্রাধিক্য। ***The Division of Labour in Society*** গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে এইসব অপ্রকৃতিস্থ বা অস্বাভাবিক অবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা ও বিশ্লেষণ রয়েছে। এই অবস্থাকে তিনি ধনতন্ত্রের 'বিকারগ্রস্থ রূপ' *(pathological forms of Capitalism)* বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি এইসব সমস্যাকে বিশেষ করে অসমতা, নানারকম মানসিক নিঃসঙ্গতাবোধ, 'অনিয়ন্ত্রণ' বা 'নিয়মহীনতাকে' *'anomie'* নামে অভিহিত করেছেন। এটা ধনতান্ত্রিক সমাজের এমন এক অবস্থা যেখানে ব্যক্তির আচরণের ওপর কোন স্থির নির্দিষ্ট বাধানিষেধ থাকে না। এই অবস্থা দেখা যায় অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সংকট বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে। বাজার অর্থনীতির উদ্ভব ও বিকাশের ফলে উৎপাদন ধীরে ধীরে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। বৃহৎ শিল্পের মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়; ফলে সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন আসে। একদিকে শ্রমিকদের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়, অপর দিকে ধনতন্ত্রে ক্রমাগত মানুষের পরিবর্তে যন্ত্রের ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া হতে থাকে। যন্ত্র মানুষের স্থান/ জায়গা দখল করে। দুর্খায়েমের ভাষায় ঃ

> *The workers is regimented, separated from his family throughout the day.*

এই পরিবর্তনগুলো এতো দ্রুততার সঙ্গে হতে থাকে যে দ্বন্দ্বশীল স্বার্থগুলোর মধ্যে সমন্বয় বা ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না। বৃহদাকার শিল্পব্যবস্থার বিকাশ ছোট ছোট উদ্যোগের ঐক্যবদ্ধ রূপকেও ভেঙ্গে ফেলে; দুটি বিরাট শ্রেণী পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণী দ্বন্দ্বশীল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। দুর্খায়েম পুঁজিবাদী সমাজের এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন নি। পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পসমাজের বাধাবন্ধনহীনতাকে ব্যাখ্যা করতে তিনি মানবচরিত্র বিশ্লেষণে হাত দিয়েছেন। অ্যানোমির কারণ অনুসন্ধান কাতে গিয়ে তিনি ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দিকের বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন যে *'anomie'* র কারণ মানুষের চরিত্রের মধ্যেও আছে।

দুর্খায়েম মানুষের সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা ও বিধিবিধান ভেঙ্গে পড়ার মধ্যে এ্যানোমির সন্ধান করেছেন। প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সংগতির সঙ্গতিপূর্ণ সামঞ্জস্য না হলে কোন মানুষই সুখী হতে পারে না। মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সংগতির একটা সাম্যাবস্থা সবসময়ই বর্তমান থাকে কারণ সেখানে থাকে স্বয়ং ক্রিয় স্বতঃস্ফূর্ততা। প্রাণীর প্রয়োজনীয়তা তার দেহের ওপর নির্ভরশীল এবং তা প্রাকৃতিক বা বিষয়ত অবস্থা নির্ভর। প্রাণীর পক্ষে চিন্তামূলক বা বিষয়ীগতভাবে অন্যতর, ভিন্নতর চাহিদা বা উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। তাদের চাহিদা স্বতঃস্ফূর্ত, একান্তই তাৎক্ষনিক ও একমাত্রিক। মানুষের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুর্খায়েমের মতে, মানবেতিহাসের প্রথম পর্ব থেকেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা ক্রমবর্ধনশীল। মানুষের জৈব বা মনস্তাত্ত্বিক গঠনের মধ্যে এমন কিছু নেই যা তার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষাকে সীমিত বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যদি কোন শক্তিই তার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষাকে সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তাহলে এই আকাঙ্ক্ষাই তার আত্মপীড়নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা কোনসময়েই পরিতৃপ্ত হয়না এবং এই অতৃপ্তি একধরনের *morbidity*-র চিহ্ন মাত্র। ***সীমাহীন হওয়ার কারণেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন ভাবে ও বিরামহীনভাবে তার সংগতিকে ছাড়িয়ে যায়।*** প্রাচীন ভারতের অন্যতম মহান চিন্তাবিদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন: কাম এবং কামনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে; অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি যেমন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, মানুষের আকাঙ্ক্ষারও তাই ঘটে থাকে।

তৃপ্তির অযোগ্য এই আকাঙ্ক্ষাই বা তৃষ্ণাই মানুষের 'আন্তর জ্বলুনির' কারণ বলে দুর্খায়েম মত প্রকাশ করেছেন।

যেহেতু মানুষের এই অসীম আকাঙ্ক্ষা সবসময়ে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়, তাই বহিঃশক্তির দ্বারা এই আকাঙ্ক্ষার নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ধর্ম এবং নৈতিক শক্তির মাধ্যমে এই আকাঙ্ক্ষার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হয়। সমষ্টিগত শৃঙ্খলা এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা যায়। সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ নানারকম বিধিব্যবস্থা উদ্ভাবনের মাধ্যমে মানুষের আকাঙ্ক্ষার ওপর সীমা আরোপ করতে পারে।

কিন্তু মাঝে মধ্যেই শৃঙ্খলার মধ্যে বিশৃঙ্খলা আসে, সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক নৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পাড়ে এবং বিধিশূন্যতার আবির্ভাব ঘটে। দুর্খায়েম বলেছেন :

> But when society is disturbed by some painful crisis or by beneficent but abrupt transitions, it is momentarily incapable of exercising this influence; thence come the sudden rises in the curve of suicides...........In the case of eco-

nomic disasters, indeed, something like a declassification occurs which suddenly casts certain individuals into a lower state than their previous one Then they must reduce their requirements, restrain their needs, learn greater self-control All the advantages of social influence are lost so far as they are concerned; their moral education has to be recommenced. But society cannot adjust them instantaneously to this new life and teach them to practise the increased self-repression to which they are unaccumstomed. So they are not adjusted to the condition forced on them, and its very prospect is intolerable; hence the suffering which detaches them from a reduced existence even before they have made trial of it.

অর্থনৈতিক সংকট বা বিপর্যয়, শিল্পসংকট অথবা আকস্মিক উন্নতি সমাজ প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত বিধিবিধান ও মূল্যবোধকে ভেঙ্গে ফেলে। মাঝে মাঝেই এটার আবির্ভাব ঘটে; আধুনিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় *anomie* তাই একটা 'চিরকালীন অবস্থা' এটাকে পুরোপুরিভাবে দূর করা যায় না। কিছুটা নিয়তির মত। দুর্খায়েম সুচারু ভাষায় লিখেছেন ঃ

The scale is upset; but a new scale can not be immediately improvised. Time is required for the public conscience to reclassify men and things.

আকস্মিক পরিবর্তনে এক ধরনের নিয়মহীনতা আসে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধরনের কোন সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় না; সমষ্টিগত বিবেক নতুনভাবে মানুষ ও 'বস্তুকে' মতাদর্শগতভাবে নির্দিষ্ট রূপ দিতে পারে না। কারণ তা তৈরী হয় না, বা হওয়ার সম্ভাবনা গড়ে ওঠে না। পরিবর্তিকালীন সমাজে মানুষের আকাঙ্ক্ষার ওপর নিয়ন্ত্রণবিধি না থাকার কারণে তা দুর্দমনীয়ভাবে বেড়ে চলে। **যে গন্তব্যে যাওয়ার উপায় নেই, যে সম্পদ আহরণের সামর্থ্য নেই মানুষ ক্রমাগত তার পিছনে ছোটে, ক্লান্তিহীন, যেন 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর।'**

দুর্খায়েম বলেন, এমনি নিয়মহীন নিয়ন্ত্রণহীন সময়ে অ্যানোমিক আত্মহননের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কিন্তু এটা তাদেরই মধ্যে বৃদ্ধি পায় যারা ধনী, যারা বিবাহবিচ্ছেদ করেছে। অর্থনৈতিক বিধিশূন্যতার মতই গার্হস্থ্য জীবনে আসে নানারকমের বিচ্যুতি ও বিযুক্তি। জীবনের অর্থ হারিয়ে যাবার ফলে সাংসারিক জীবনের সম্পর্কের মধ্যেও দেখা যায় নিয়মহীনতা। মানুষ বুঝতে পারে না কি সে চায়। ফলে মানুষ নিজেকে নিঃসঙ্গ একাকী ও পরিত্যক্ত (lost and abandoned) বলে ভাবে। অর্থনৈতিক প্রগতির উচ্চমাত্রাও সবরকমের পুরোনো শিল্প সম্পর্ককে ভেঙ্গে ফেলে। ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন কার্যকরী ও প্রভাবশালী নৈতিক নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

ধর্ম তার ঐক্যবিধানকারী শক্তি হারিয়ে ফেলে। এমনিতেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নের ফলে মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব কমে যায়। আর বিধিশূন্যতা

দেখা দিলে ধর্মও আর পুরোনো 'শিক্ষামালা' দিয়ে মানুষের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে না। দুর্খায়েমের মতে, ধর্ম, সরকার, কতৃপক্ষ প্রত্যেকেই নিয়ন্ত্রণ আরোপের পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণ বিহীনতাকেই প্রাধান্য দেয়। বর্তমান ভারতবর্ষের চিত্র দেখলে দুর্খায়েমের এসব কথার সত্যতা প্রমাণিত হতে পারে। আমাদের দেশে এখন অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধিশূন্যতা দেখা দিয়েছে; মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও সীমাহীন হয়ে উঠেছে। নিয়ম, বিশ্বাস, মূল্যবোধের পরিবর্তে নিয়মহীনতার মধ্যেই মানুষ উপরের সারিতে উঠতে চাচ্ছে। ন্যায়নীতি, সমাজস্বীকৃত মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে, গেছে। ধর্মও আর প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারছে না, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না। দুর্খায়েম লিখেছেন ঃ

> Religion has lost most of its power. And government, instead of regulating economoc life, has become its tool and servant. The most opposite schools, orthodox economists and extreme socialists unite to reduce government to the role of a more or less passive intermediary among the various social functions..... on both sides nations are declared to have the single or chief purpose of achieving industrial prosperity; such is the implication of the dogma of economic materialism, the basis of both apparently opposed system.......appetites thus exicited become freed of any limiting authority... . Ultimately this liberation of desires has also been made worse by the very development of industry and the almost infinite extension of the market.... .... such is the source of the excitement. Predominating in this part of the society, and which has thence extended to the other parts. There the state of crisis and anomy is constant and, so to speak, normal. From the top to bottom of the ladder,greed is aroused without knowing where to find ultimate foothold. Nothing can calm it, since its goal is far beyond all it can attain......A *thirst arises for novelties, unfamiliar pleasures, nameless* sensations, all of which lose their saviour once known. Henceforth, one has no strength to endure the last reverse.........weariness alone, moreover, is enough to bring disillusionment, for he cannot in the end escape the futility of an endless pursuit.

দ্রুত সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনই অ্যানোমির সৃষ্টি করে না, ক্রমবর্ধমান শ্রমবিভাগও এই অবস্থার উদ্ভব ঘটায়। ব্যক্তিগত স্বার্থ পৃথকীকরণের মাত্রা বৃদ্ধি করে; ব্যক্তি তার নিজের

মতো করে জীবন পরিচালিত করতে চায়; নৈতিক নিয়মের শৃঙ্খলে থাকতে চায় না; তাকে ভেঙ্গে ফেলতে চায়। আসলে তা ভেঙ্গেই যায় ফলে সে নিজস্ব ভাবনায় ভাবিত হয়; অপরের চিন্তা, সমাজের মঙ্গলের কথা সে ভুলে যায়। সামাজিক সংহতি তাই ভেঙ্গে পড়ে। দুর্খায়েম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থক ছিলেন কিন্তু তার মতে সীমাহীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সামাজিক ঐক্য ও সামাজিক শৃঙ্খলায় ভাঙ্গন ধরায়; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অধিকারের ওপর অতিরিক্ত জোর দেয়; দায়িত্ব বা কর্তব্যের প্রশ্ন এড়িয়ে যায়, অপরের প্রতি, সামগ্রিকভাবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ভুলে যায়। পরার্থপরতা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি গুণগুলোকেই বিসর্জন দেয়া হয়ে থাকে। এভাবেই দুর্খায়েম সামাজিক নিসঙ্গতাবোধ ও বিধিশূণ্যতার চিত্র আঁকেন। এ চিত্র এক মর্মান্তিক চিত্র।

প্রকৃতপক্ষে নিয়মহীনতা বা মূল্যবোধ বা বিশ্বাসকাঠামোর অনুপস্থিতি বলতে কী সাধারণভাবে সমাজের, না নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের, নির্দিষ্ট শ্রেণীর মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়ার কথা দুর্খায়েম বলেছেন? কারখানা ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণী বুর্জোয়া নিয়মকাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, অন্যদিকে তাদের নিজস্ব সম্প্রদায় দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব সংগঠনের ধারণা বা মূল্যকাঠামোগুলো হল পারস্পরিক সহযোগিতা, সংহতি ও আনুগত্যবোধ। কিন্তু মালিক পক্ষ এবং ব্যবস্যা সংগঠন তাদের নিজস্ব বুর্জোয়া মূল্যকাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং বিধিশূণ্যতা বা নীতিমালার অভাব বা বিসংগঠন বলতে প্রচলিত সাবেকী বুর্জোয়া নিয়মকানুন ও বিধির অভাব বোঝায়; বুর্জোয়া মতাদর্শ ও শৃঙ্খলার অভাবকে বোঝায়। সমগ্র সমাজের নিয়ম বা বিধির অভাব বোঝায় না। প্রতিটি শ্রেণী বা গোষ্ঠীর নিজস্ব বিধি বা মূল্যবোধ থাকে, নিজস্ব জীবনধারণের পদ্ধতি থাকে, সংস্কৃতি কাঠামো থাকে। দুর্খায়েম যে বিধির বা প্রতিষ্ঠানের আরোপ করতে চান কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তা আসলে বুর্জোয়া কর্তৃত্ব। আধিপত্যকারী মতাদর্শ নিশ্চিতভাবেই শাসকশ্রেণীর বিধিকেই নিয়োগ করতে চায়। কারণ সংকটটা আসলে তাদেরই। শ্রমিক শ্রেণী তাদের সংগ্রামের মাধ্যমে বুর্জোয়া শাসনের অতিকেন্দ্রিকতা, শোষণ ও সংকটকে অতিক্রম করতে চায়। শ্রমিক শ্রেণীর হরতাল বা আন্দোলনকে কিন্তু অ্যানোমির উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না, কারণ তা ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যপ্রদ বিরোধিতা । বিরোধিতাকে কী কখনো অ্যানোমি বলা যায়?

দুর্খায়েমের ত্রুটি হল তিনি মানবিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে অ্যানোমির বিশ্লেষণ করেছেন। এটা যেন প্রথম যুগের হবস্ বা অ্যাডাম স্মিথের চিন্তাভাবনার সঙ্গে মিলে যায়। আত্মকেন্দ্রিকতা বা পরকেন্দ্রিকতা দিয়ে কোন সামাজিক ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। দুর্খায়েম বা তাঁর আগে কোঁৎ এর সমস্যা ছিল কিভাবে শ্রমিক আন্দোলনের হাত থেকে ধনতন্ত্রকে রক্ষা করা যায়, সেই আন্দোলনগুলোকে প্রতিহত করা যায়। ***আসলে দুর্খায়েম বুর্জোয়া মতাদর্শকে কখনই আঘাত করতে চান নি, বরং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে যে আঘাত এসেছিল তাকে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়, তার জন্য প্রয়োজন ছিল তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরী করা। এ কারণেই দুর্খায়েম সাধারণভাবে মানুষের চরিত্রকেন্দ্রিক আলোচনা করে বোঝাতে চেয়েছেন যে এটা সমগ্র সমাজের 'অসুস্থতা'। সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎপত্তি হয় না, এটা বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত; যেখানে ব্যক্তিগত আত্মকেন্দ্রিকতা ও লোভের বিষয়কে বৈধতা দেয়া হয়েছে।*** ব্যক্তিগত সম্পত্তিব্যবস্থার ওপরেই

ধনতান্ত্রিকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন দেখাও সম্ভব নয়, বা তারা সেটা সাংস্কৃতিকভাবে চায়ও না। দুর্খায়েম যে সব বিষয়ের প্রশংসা করেছেন সেই সব বিষয় যেমন সংহতি ও পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সহযোগিতা শ্রমিক আন্দোলনের মৌলিক মূল্যকাঠামো।

আসলে দুর্খায়েম ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরোধী ছিলেন না, তিনি তাকেই বৈধতা দিয়েছেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন তিনি চান না, যেমন চাননি কোঁৎ। এ ব্যপারে দুর্খায়েম বলেছেন ঃ

> The pathological state of modern society, with it 'morbidity', 'pessimism', its 'rising tide of suicide' its abnormal (anomic) division of labour, can mean only that the 'social organism' has 'reached a degree of abnormal intensity'. the result is that anarchists, mystics and socialist revolutionaries share a hartred of the present and a 'disgust for existing order' with a single craving to destroy and escape reality. For life is 'often harsh, treacherous or empty' and the function of social theory is to point to this inescapable fact, the necessity for 'collective sadness', and thus help to establish the collective authority which will prevent this sadness from reaching morbidity.

দুর্খায়েমের মতে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও ব্যবসা বানিজ্য নির্ভর ব্যক্তিগত স্বার্থকে কতকগুলো নৈতিক নিয়ম দিয়ে বাঁধতে হবে। অর্থনৈতিক সমিতি গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা দমন করে সামাজিক সংহতির পক্ষে শক্তিকে জোরদার করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের শিল্পকে কতকগুলো প্রশাসনিক সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এইসব সংস্থার হাতে নিয়োগকর্তা ও চাকরিজীবির সম্পর্ক, মজুরি, বেতন এবং প্রতিযোগিদের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দিতে হবে। এসব সংস্থাগুলো অ্যানোমিক সমস্যার সমাধান করতে পারে দু'ভাবে ঃ

১) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে রোধ করে ব্যক্তিবর্গকে একটা সামাজিক গোষ্ঠীতে রূপান্তর করে সামাজিক সংহতি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে;

২) এর মাধ্যমে ঐক্যমত (Consensus) সৃষ্টি করা যেতে পারে। এই ঐক্যমতের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। দুর্খায়েমের মতে উত্তরাধিকার নিয়ম এইসব ব্যবস্থার মাধ্যমে অবলুপ্ত হবে, সমাজ কতকগুলো পেশাভিত্তিক কাজকর্মের সমন্বয়ে পরিণত হবে এবং সমাজের প্রত্যেকেই তার পেশাগত যোগ্যতার ও অবদানের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক পুরস্কার পাবে। এইভাবে বিভিন্ন সেবা কার্যের মাধ্যমে সম্প্রদায়গত উন্নতি সম্ভব হবে। দুর্খায়েম মনে করেন যে এই সংস্থাগুলো থাকার ফলে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দুর্খায়েমের মতে স্বেচ্ছাসংগঠনগুলো না থাকলে রাষ্ট্র অতিরিক্তমাত্রায় শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আবার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকলে এই সব সংস্থাগুলো স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে। উপরন্তু, রাষ্ট্র জাতীয় স্তরে অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ওপর নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তাদের মধ্যে

সমন্বয় করবে এবং সকলের জন্য সাধারণ নৈতিক নীতি নিরূপণ করবে। রাষ্ট্রই নৈতিক ঐক্যমত সৃষ্টি করতে এগিয়ে আসবে এবং এটাই সামাজিক সংহতির অপরিহার্য শর্ত হিসেবে কাজ করবে।

দুর্খায়েমের আরো অভিমত হ'ল ধনতান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন রোগের মধ্যে রয়েছে অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা, শ্রেণীদ্বন্দ্ব, কাজের একঘেয়েমি। বৈষম্যকেও তিনি জৈব সংহতির বিরোধী শক্তি বলেই মনে করেন। এটা তাঁর মতে শ্রমবিভাগের 'abnormal form'। শ্রেণী সমাজ সুযোগ সুবিধার সমতাকে নষ্ট করে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিভিন্ন বর্গের মানুষকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজে স্থান করে নিতে দেয় না। শ্রমবিভাগের ফলে উদ্ভূত এইসব রোগের নিরাময় হতে পারে। প্রথমত, শ্রেণীদ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধানের মাধ্যমে এবং প্রতিযোগিতাকে একটা সীমার মধ্যে রেখে। ন্যায়বিচার ও সামাজিক সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে সমতা সৃষ্টি করে সামাজিক সংহতি রক্ষা করা সম্ভব।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সবধরনের বৈষম্যের অবসান করে নতুন সমাজ সৃষ্টির কথা দুর্খায়েম বলেন না। তিনি বলেন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ওবৈষম্য থাকবে তাকে সহনীয় করে তুলতে হবে; শোষণ থাকবে তাকে কিছুটা স্নিগ্ধ করে তুলতে হবে। তাছাড়া দুর্খায়েম শ্রমবিভাগের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধিকে সামাজিক সংহতি ভেঙ্গে পড়ার কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এটাও সঠিক ব্যাখ্যা নয়। মার্ক্সের মতে, শ্রেণী সম্পর্কের দ্বন্দ্বশীল চরিত্রের মধ্যেই সামাজিক বৈষম্য লুকিয়ে আছে; উৎপাদন সম্পর্কের ব্যক্তিমালিকানার মধ্যেই শ্রেণীদ্বন্দ্বের মূল নিহিত। বিভিন্ন পেশার পৃথকীকরণও শ্রেণীদ্বন্দ্বের কারণ হতে পারে না। উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি আহরিত হোক কিংবা নিজে থেকে অর্জিত হোক, তা মূল ঘটনা হতে পারে না, মূল ঘটনা বা বাস্তবতা হ'ল ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্ক যা ধনতান্ত্রিক সমাজের (দুর্খায়েমের ভাষায় সাধারণভাবে শিল্পসমাজ) অন্যান্য সামাজিক, রাজনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে। এটাই পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

যেভাবে দুর্খায়েম পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বা তাঁর ভাষায় শিল্পসমাজের ক্রটি দূর করতে চেয়েছেন, বা নির্দেশনামা দিয়েছেন তা অবাস্তব ও কাল্পনিক; যদিও তিনি তাঁর পরবর্তী লেখাপত্রে শ্রমবিভাগের বিষয়ে আর বেশী আলোচনা করেননি কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বজায় রেখে, তাকে বৈধতা দিয়ে তার ত্রুটি দূর করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারলে, নির্দিষ্ট কতকগুলো মূল্যকাঠামো তৈরী করতে পারলে এই ব্যবস্থা কাম্য ও গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা, এটাই তিনি বলতে চেয়েছেন।

ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের সমাজতত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সামাজিক বিরোধের বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মতে, ব্যক্তির মানবিক বিকাশকে অস্বীকার করলে সামাজিক বিকাশ সম্ভব হবে না। যদি মানুষ তার পেশাগত কাজের মাধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তবে সে যন্ত্রে পরিণত হবে। তাহলে কী করতে হবে? কিভাবে এই যন্ত্র দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তি লাভ সম্ভব? তাঁর মতে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলীর *মধ্যে সুসংগঠিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক।* ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও জৈব মতবাদ - উভয়েরই তিনি সমালোচনা করেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ গুরুত্ব দেয় ব্যক্তির ওপর আর ব্যক্তির

ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে সমাজের গুরুত্ব হ্রাস করতে চায়। আবার জৈব মতবাদ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে সমাজ সমগ্রকে গুরুত্ব দেয়। ব্যক্তি সমাজের কোষের মত। জীবদেহ ছাড়া যেমন জীবদেহের অংশগুলো মূল্যহীন, তেমনি সমাজ ছাড়া ব্যক্তি মূল্যহীন। দুর্খায়েমের মতে, উভয় মতবাদই ভ্রান্ত। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা। ব্যক্তির সুখ ও সমৃদ্ধি সামাজিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। আবার মানুষের সামাজিক বিষয়কে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখলেই তা সম্ভব হয়। ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ উভয়ের সমন্বয়েই আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে।

দুখ।য়েম পুঁজিবাদী সমাজের ত্রুটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এটা বলতে ভোলেননি যে পৃথকীকরণ ও বিশেষীকরণ প্রক্রিয়া মানুষের নৈতিকমানের 'অবনয়ন' ঘটায়। যখন একজন শ্রমিক একই কাজের পুনরাবৃত্তি করে সে তখন বহিঃশক্তির প্রভাবেই একটা 'নিষ্ক্রিয় চাকায়' পরিণত হয়। দুর্খায়েমের মতে, এই ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সার্বজনীন শিক্ষা কিংবা শিল্পসাহিত্যের আগ্রহ সৃষ্টিও যথেষ্ট নয়, তাহলে শ্রমিক শ্রেণীর বাস্তব জীবন সম্পর্কে আরও মানসিক জ্বালার সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ তিনি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থক হিসেবে শ্রমিকের বাস্তব জীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের বিষয়কে ভীতির চোখেই দেখেছেন।

তাহলে শ্রমবিভাগের ফলে উদ্ভূত সমস্যার বিশেষ করে 'অ্যানোমি'র নিরাকরণ কীভাবে ঘটবে? দুর্খায়েমে মতে শ্রমবিভাগের মধ্যে সঠিকভাবে বললে নেতিবাচক কিছু নেই, যা আছে তা হ'ল কতকগুললো 'অস্বাভাবিক অবস্থা'। সামাজিক প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হয়ে, যৌথ ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমেই শ্রমিক শ্রেণী তার সামর্থ্য ও যোগ্যতার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। তিনি এও বিশ্বাস করেন যে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার ক্রম-অবসান করে, ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সমন্বয়ের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিকে তার যোগ্যতা অনুসারে সুযোগ দিয়েই সমস্যার সমাধান করা যায়। দুর্খায়েমের মতামত, কিছুটা সাঁ সিমঁর সামাজিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সাম্য, ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতা আসলে ধনতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থার মতাদর্শগত ভিত্তি। আধুনিক শিল্পসমাজের সঙ্গে এই ধারণাগুলো সম্পৃক্ত। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকটের যুগে এবং সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিকাশের যুগে এবং ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলনের সাফল্যের যুগে দুর্খায়েম ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পক্ষে উপযুক্ত শ্লোগানেরই পুনরাবৃত্তি করেন।

দুর্খায়েমের আরো ধারণা যে ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রাথমিক স্তরে 'ব্যক্তির স্বাধীনতার' ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের ফলেই ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অ্যানোমিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, কিন্তু বিকাশের মাত্রায় সে নিজেকে ধীরে ধীরে সকলের সঙ্গে যুক্ত করে নিজেকে সামাজিকভাবে সংগঠিত করে, নিজেকে শোধরায় এবং বিশেষীকরণের ফলে যা সে হারিয়ে ফেলেছিল (অর্থাৎ মানবিক বিকাশ) তা ফিরে পায়। তাঁর আরো পরিস্কার অভিমত হ'ল, ধনতান্ত্রিক সমাজকে সংস্কার করে বিকশিত করতে পারলে ন্যায় বিচার সম্ভব হবে এবং পূর্ণ ধনতান্ত্রিক সমাজে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যাবে। সামাজিক প্রক্রিয়াকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় বলে তিনি বিশ্বাস করেন এবং তিনি সুপারিশ করেন ঃ

> to suppress useless tasks to distribute work in such a way
> that each one will be sufficiently occupied and consequently

to increase the functional activity of each worker. Thus order will be achieved at the same time, that work is more economically managed

অর্থাৎ দুর্খায়েম শ্রমিকের আন্দোলনে বিশ্বাস করেন না; বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন সমাজ সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর বিরোধিতা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেন। প্রতিটি শ্রমিকের 'কর্মগত' কর্মপ্রক্রিয়ার উপর তিনি গুরুত্ব দেন। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের কর্মকর্তা হিসেবে শ্রমিকের অবস্থানকে তিনি মেনে নিতে পারেন না। আসলে দুর্খায়েম ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান চান না; তা তার কাঙ্ক্ষিতও হতে পারে না, কারণ তিনি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতাদর্শগত ও সংহতিগত বিশৃঙ্খলার অবসান চান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বার্থেই। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উন্নত, পরিশীলিত ও মার্জিত করতে চান। সামাজিক ঘটনাবলী বিশেষ করে শ্রমবিভাগের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েও তিনি আসলে কোঁৎ প্রতিষ্ঠিত ইষ্টবাদকে অতিক্রম করতে পারেন না। তিনিও সামাজিক সম্পর্ককে নৈতিক ও আইনগত দিক থেকেই নিয়ন্ত্রণ করে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করতে চান। কোঁৎ ধনতান্ত্রিক সমাজের বৈধতা দেবার ক্ষেত্রে মতাদর্শগত ধারণা কাঠামো সৃষ্টির প্রথম ইষ্টবাদী সমাজতাত্ত্বিক; দুর্খায়েম বিকশিত ও সংকটে দীর্ণ ধনতান্ত্রিক সমাজের বৈধতা দেবার জন্যই তাঁর সমাজতত্ত্ব নির্মাণ করেছেন। তিনি ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের বিশেষ করে 'অ্যানোমির' যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তা শোধরানোর যে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন তা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্থায়ী করে তোলারই ব্যবস্থা। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংশোধনের মাধ্যমে তিনি একে একটা মানবিক রূপ (humanized shape) দেবার চেষ্টা করেছেন। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের অবসান করে নতুনভাবে সমাজকে পুনর্গঠনের স্বপ্ন বা তত্ত্ব রচনা তাঁর নয়, সে স্বপ্ন কার্ল মার্ক্সের।

দুর্খায়েমের বিধিশূন্যতা তত্ত্ব এবং মার্ক্সের বিচ্ছিন্নতা তত্ত্ব — একটি তুলনা

What is human becomes animal, what is animal becomes human.
— Karl Marx.

অনেক সমাজতাত্ত্বিক দুর্খায়েমের অ্যানোমির সঙ্গে মার্ক্সের অ্যালিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতার তুলনামূলক আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে এ দুটি ধারণা প্রায় একই ধরনের। দুর্খায়েমের অ্যানোমির ধারণাও একধরনের সমাজবিচ্ছিন্নতাকেই তুলে ধরেছে। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। দুর্খায়েম অ্যানোমি ধারণা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সরাসরি যুক্ত করেন নি। মার্ক্স বিযুক্তিকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনিবার্য ফল হিসেবে দেখেছেন এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের অমানবীয়করণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করেছেন। অ্যানোমি হল বিধিশূন্যতা; বিচ্ছিন্নতা হল ব্যক্তি শ্রমিকদের এবং শ্রমিক শ্রেণীর বাস্তব সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে যুক্ত এক আত্মবিচ্ছিন্নতা। মার্ক্সের বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে আলোচনা করলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হবে।

মার্ক্সের সামাজিক তত্ত্বের অন্যতম বিষয় হল বিচ্ছিন্নতা তত্ত্ব। তাঁর মতে, মানুষের ইতিহাস শুধু শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস নয়, এটা মানুষের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতারও ইতিহাস। বুর্জোয়া ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নতা একটা অতিপরিচিত বাস্তবতা; উৎপাদন প্রক্রিয়াও এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি। মার্ক্স বিচ্ছিন্নতাকে প্রধানত অর্থনৈতিক দিক থেকেই ব্যাখ্যা করেছেন। যে শ্রম মানুষের জীবনের মূল সম্পদ তাকেই শ্রমিক বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হয়। বিচ্ছিন্ন শ্রম চারটি দিকের নির্দেশ করে ঃ

১) শ্রমিক তার শ্রমে উৎপাদিত বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন;

২) শ্রমিক উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন;

৩) শ্রমিক নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন;

৪) শ্রমিক তার সম্প্রদায় বা সহকর্মীদের বা অপর মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন।

মার্ক্সের মতে ঃ

> alienation appears not merely in the result but also in the process of production, within productive activity itself.............If the product of labour is alieniation, production itself must be active alienation........The alienation of the object of labour summarises the alienation in the work activity.

ধনতান্ত্রিক সমাজে কিভাবে মানুষের মানবিক সত্তা নষ্ট হয়, কিভাবে সে তার প্রকৃত সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, কিভাবে তাঁর মানবিক বিকাশ রুদ্ধ হয় তার এক অসামান্য বাস্তব চিত্র মার্কস তুলে ধরেছেন তাঁর Economic and Philosophic Manuscripts গ্রন্থে।

একধরনের দাসত্বের পরিবেশে শ্রমিককে উৎপাদন করতে হয়, এক আনন্দহীন বাধ্যবাধকতার মধ্যে থেকে তাকে কাজ করতে হয়। মালিকের সার্বভৌম শক্তির কাছে সে সঁপে দেয় নিজেকে, দিতে হয়, দিতে সে বাধ্য। শ্রম সবকিছুর উৎস: জ্ঞান, দক্ষতা,সৃজনের সবকিছুই আসে শ্রম থেকে অথচ শ্রমিকের হাতে শ্রমের পরিবেশ, কারখানা কোনকিছুই নেই। শ্রমশক্তিও তার হাতে নেই। ***সে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, পরিবেশ দ্বারাই সে নিয়ন্ত্রিত।***

যে শ্রমশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সে বস্তুসমূহ তৈরী করে তাই মালিকের পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়ে তার বিরুদ্ধে খাটে। শ্রমিকের সঙ্গে তার উৎপন্ন দ্রব্যের সম্পর্ক যেন শত্রুতার সম্পর্ক। সে তার সৃষ্টিকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন। তার থেকেও বড়ো কথা সে নিজেই পণ্য।

বুর্জোয়াদের হাতে শ্রমিক শ্রেণী শোষণের শিকার। যতই সে ধনিকের মূলধন বৃদ্ধি করে ততই সে নিঃস্ব হতে থাকে। যতই শ্রম বস্তুর জগতকে বৃদ্ধি করে চলে ততই মানবিক জগতের অবনতি ঘটে। জীবন্ত শ্রমিক পরিণত হয় বস্তুতে, পণ্যগুলোই যেন হয়ে ওঠে জীবন্ত। সমগ্র মানবিক সম্পর্কই উল্টে যায়। শ্রমিক তার নিজের সৃষ্টির হাতেই বন্দী হয়ে যায়। সে মজুরী দাসে পরিণত হয়। তার শ্রম অপরের জন্য তৈরী করে অট্টালিকা, সম্পদ, সৌন্দর্য, বিলাস ও বুদ্ধি, আর নিজের জন্য তৈরী করে নির্বুদ্ধিতা, দুঃখকষ্ট,অসৌন্দর্য। বুর্জোয়া সমাজে শ্রম হ'ল বাধ্যতামূলক, স্বেচ্ছাধীন নয়। এ শ্রম অপরের, তার আত্মবিলুপ্তির সামিল। বস্তুগুলো তার সৃজনশীলতার প্রকাশ না হয়ে মালিকের সম্পত্তি হিসেবে উপস্থাপিত হয়। এই সম্পত্তি মালিক যেভাবে ব্যবহার করতে চায় সেভাবেই সে ব্যবহার করতে পারে। শ্রমিকের এতে কোন হাত নেই। মার্ক্স উল্লেখ করেছেনঃ

> This fact expresses merely that the object which labour produces - labour's product - confronts it as something alien, as a power independent of the producer. The product of labour is labour which has been congealed in an object, which has become material; it is the objectification of labour. Labour's realization is its objectification. In the conditions dealt with by Political Economy this realization of labour appears as loss of reality for the workers; objectification as loss of the object and object bondage, appropriation estrangement, as alienation.

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক যখন শ্রমশক্তি বিক্রয় করে তখন সে স্বাচ্ছন্দ্যভোগ করে না, নিজেকে পূর্ণ করে তুলতে পারে না, নিজেকে যেন অস্বীকার করে; তার স্বাচ্ছন্দ্যের থেকে দুর্দশাবোধে ভোগে, স্বাধীনভাবে তার মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পারে না, দৈহিকভাবে ক্লান্ত ও মানসিকভাবে হীন হয়ে পড়ে। তাই শ্রমিক শুধু তার অবসর সময়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে আর

কাজের মধ্যে সে অনুভব করে আশ্রয়হীনতা। মার্ক্স অননুকরণীয় ভাষায় লিখেছেন ঃ

> First the fact that labour is external to the worker, i.e., it does not belong to his essential being; that in his work, therefore, he does not affirm himself but denies himself, does not feel content but unhappy, does not develop freely his physical and mental energy but mortifies his body and ruins his mind. The worker, therefore, only feels himself outside his work, and in his work he feels outside of himself. He is at home when he is working, and when he is working he is not at home. His labour is therefore not voluntary, but coerced; it is forced labour. It is therefore not the satisfaction of a need; it is merely a means to satisfy needs external to it.Its alien character emerges clearly in the fact that as soon as no physical or other compulsion exists, labour is shunned like the plague. External labour, labour in which man alienates himself is a labour of self- sacrifice, of mortification. Lastly, the external character of labour for the workers appears in the fact that it does not belongs to him, that in it he belongs, not to himself but to another. Just as in religion, the spontaneous activity of the human imagination of the human brain and the human heart, operates independently of individual that is, operates on him as an alien, divine or diabolical activity- in the same way the workers activity is not his spontaneous activity. It belongs to another; it is the loss of his self.

দেখা যাচ্ছে মার্ক্স এখানে দুধরনের বিরোধীশক্তির কথা বলেছেন যা শ্রমিকের শ্রমকে এবং তার উৎপাদিত দ্রব্যকে তার বিরোধী করে তুলেছে। একদিকে রয়েছে 'অন্য শক্তি' (other man) , পুঁজিপতি যে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বাজার ব্যবস্থা যা পুঁজির চরিত্র ও উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথমটি মানবিক শক্তি, অপরটি বস্তু শক্তি বা অ-মানবিক শক্তি। মানুষ হিসেবে একজন শ্রমিক অন্য মানুষের (পুঁজিপতির) অধীন; তার দয়ার ওপরে নির্ভরশীল; সেই সিদ্ধান্ত নেয়, কি সে তাকে দিয়ে উৎপাদন করাবে। সুতরাং শ্রমিকের উৎপাদিত দ্রব্যের সঙ্গে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও স্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই; কোন সৃজনশীল ক্ষমতারও প্রকাশ হয় না তার দ্রব্য উৎপাদনে। প্রকৃতপক্ষে এ সম্পদ (উৎপাদিত দ্রব্য) তার নিজের নয়, 'অন্য মানুষের'। মার্ক্স এভাবেই বিচ্ছিন্নতার এক দুর্মর ছবি আঁকেন এবং লেখেন ঃ

> alienation is apparent not only in the fact that my means of life belong to someone else..........but also that .. ..an

inhuman power rules over everything.

শ্রমিক তার প্রকৃত সত্তা (প্রজাতি সত্তা) থেকে বিচ্ছিন্ন। বিচ্ছিন্ন শ্রম শ্রমিকের প্রজাতি সত্তাকে, তার স্বাভাবিক বৌদ্ধিক ও আত্মিক শক্তিকে তার কাছ থেকে স্বতন্ত্র করে দেয়, সে নিজেকে নিজে চিনতে পারে না, আত্মবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, জন্তুসুলভ অস্তিত্বের মাধ্যে সে কালাতিপাত করে। সাহিত্য, শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতেহ্যের উপভোগ থেকেও সে বঞ্চিত হয়। এভাবেই চলে অমানবীয়করণ পদ্ধতি। ব্যক্তিত্ব, সামাজিকতা ও পরিশিলিত মার্জিত প্রয়োজনের জগতে সে প্রবেশ করতে পারে না; ফলে আত্মচ্যুতি অমানবীয়করণে রূপান্তরিত হয়। উৎপাদন কর্ম, সামাজিক জীবন ও মানবিক সাংস্কৃতিক বিকাশ তিনটি দিক থেকেই শ্রমিক শ্রেণী বঞ্চিত, শোষিত ও বিছিন্ন।

শ্রমিকের কর্মপ্রক্রিয়া তার নিজের নয়, যেহেতু তা বাধ্যতামূলক কাজ; সেই কারণেই সমগ্র উৎপাদন প্রক্রিয়া সেই বিচ্ছিন্ন শ্রমেরই প্রক্রিয়া। শ্রম (শক্তি) শক্তিশালী ও বিরোধীশক্তির জন্য ব্যয়িত হয়। মানবিক প্রজাতিসত্তার (human species being) বিকাশ তো হয়ই না, সে শোষিত হয়, বঞ্চিত হয় দুভাবে। 'অন্য মানুষের' ক্ষেত্রে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, একধরনের দাসত্ব চলতে থাকে, মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের সম্পর্ক কোন সহযোগিতা বা বন্ধুত্বমূলক হতেই পারে না, কারণ নাস্তিমান এবং অস্তিমানদের (haves and have not) সঙ্গে কীভাবেই বা মানবিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে? মার্ক্স লিখেছেন ঃ

> Through estranged, alienated labour, then the worker produces the relationship to this labour of a man alien to labour and standing outside it. The relationship of the worker to labour engenders the relation to it of the capitalist, or whatever one chooses to call the master of labour. Private property is thus the product, the result, the necessary concequence of alienated labour of the external relation of the worker to nature and to himself.

এই বিরোধী শ্রমই শ্রমিকের শ্রম ও শ্রমের ফলের ওপর মালিকানা সত্ত্বভোগ করে এবং শ্রমিকের জীবনের ওপরও আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। পুঁজিপতি ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হওয়ার কারণেই রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, প্রচলিত সম্পত্তি সম্পর্কের ওপর উৎপাদন ও বন্টনের ওপর-বৈধতার ছাপ দেয় এবং নিজের আধিপত্যমূলক ও সুবিধাপ্রাপ্ত অবস্থানকে দৃঢ় করে। এভাবেই শোষণ ও অত্যাচার চক্র চলতে থাকে।

সুতরাং মার্ক্সীয় বিচ্ছিন্নতা তত্ত্ব কতকগুলো উপাদানের উল্লেখ করেছে ঃ শ্রমবিচ্ছিন্নতা, ক্ষমতা বিচ্ছিন্নতা, আত্মবিচ্ছিন্নতা এবং অপর মানুষের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা। দুর্খায়েমের অ্যানোমি তত্ত্বের মধ্যে এরকম গভীরতাপূর্ণ কোন বিশ্লেষণই নেই। অ্যানোমি হল বিধিশূণ্যতা; সেখানে ধনতান্ত্রিক সমাজের নির্মম শোষণের কোন চিত্র বা ছবি নেই; শুধু মাঝেমাঝে সমাজে নিয়মশূণ্যতা দেখা দেয় তারই উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্খায়েমের ধারণা, যেহেতু পুঁজিবাদী নিয়মশূণ্যতা অ্যানোমির সৃষ্টি করে তাই নিয়ম বা নীতিমালার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাকে ঠিক ঠিক জায়গায়

নিয়ে যেতে পারে। এবং সামাজিক সংহতি রক্ষিত হতে পারে। কার্ল মার্ক্স বিচ্ছিন্নতা তত্ত্ব উপস্থাপন করে পুঁজিবাদী তথাকথিক সামাজিক সংহতিকে আঘাত করেছেন। দুর্খায়েম ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কয়েকটি 'বিকারগ্রস্থ' বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, সামগ্রিকভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শোষণমূলক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি কোন সমালোচনামূলক মন্তব্যই করেন নি। দুর্খায়েম অ্যানোমি তত্ত্ব উত্থাপন করে ধনতান্ত্রিক সমাজের কাঠামো কিভাবে সংরক্ষিত করা যেতে পারে তার তত্ত্ব দিয়েছেন, বৈপ্লবিক রূপান্তরের কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত দেন নি। 'বিকারগ্রস্থ বৈশিষ্ট্যই' তাঁর মতে অ্যানোমি। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা এবং শ্রমিক আন্দোলনকে তিনি কখনই প্রকৃতপক্ষে মেনে নিতে পারেন নি। ***দুর্খায়েম ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্থায়ী করার তত্ত্ব দিয়েছেন। নৈতিক ও আইনগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ধনতন্ত্রের ত্রুটি দূর করতে চেয়েছেন।***

দুর্খায়েম Division of Labour গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে মার্ক্সীয় শ্রমবিভাগ সম্পর্কে আলোচনাসূত্রের ব্যবহাব করেছেন; তিনি উল্লেখ করেছেন এটা হল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্বাভাবিক বা বিকারগ্রস্থ বিষয় কিন্তু ধনতন্ত্রের অস্বীকার তিনি করেন নি। ***দুর্খায়েম ঐতিহাসিকভাবে শ্রমবিভাগের ব্যাখ্যা করেন নি; কেন শ্রমবিভাগ বিকারগ্রস্থ রূপ গ্রহণ করেছে তার ব্যাখ্যা করেন নি; শুধু বলেছেন যে শ্রমবিভাগের অস্বাভাবিকতার ফলে সামাজিক সংহতি বিঘ্নিত হয়েছে।***

মার্ক্স ধনতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করেছেন শোষণকে ভিত্তি করে; কিভাবে শ্রমিক শ্রেণীর ওপর সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে শোষণ করে ধনতন্ত্র মার্ক্স তা আমাদের দেখিয়েছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তিব্যবস্থার ফলেই শ্রমিকের আত্মচ্যুতি ঘটে। এটাই মার্ক্সের বিচ্ছিন্নতা তত্ত্বের মৌলিক প্রত্যয়। এথেকে ঘটে নানারকম বিচ্ছিন্নতা। সুতরাং বিচ্ছিন্নতা প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকের ভাগ্য; কিন্তু দুর্খায়েম বলেছেন আধুনিক সমাজ (যেন ধনতান্ত্রিক সমাজ নয়) মানুষকে দুর্দমনীয় লোভী করে তোলে এবং মানুষ শুধু সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা পূরণের দিকে ধাবিত হয়। দুর্খায়েমের মানুষ হল বিমূর্ত মানুষ (আসলে সে ধনিক) কিন্তু দুর্খায়েম আধুনিক 'সমাজ' 'মানুষ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে অ্যানোমি বিষয়টিকে বর্তমান সভ্যতার (যেন তা ধনতান্ত্রিক সমাজ নয়) অসুখ বলে চিহ্নিত করেছেন এবং ব্যবস্থার মধ্যেই তার নিরাময় করা যায় বলে মন্তব্য করেছেন। মার্ক্সের সঙ্গে দুর্খায়েমের এখানেই পার্থক্য, তাঁর মতে ব্যক্তিগত সম্পতি ব্যবস্থার অবসান করে সমাজকে প্রকৃত মানবিকভাবে পুনর্গঠন করলে শ্রমিক শ্রেণীসহ অপরাপর শোষিত শ্রেণীর মানবিক বিকাশ সম্ভব হবে। দুর্খায়েমের মতে বিধিশূন্যতা দূর করা প্রয়োজন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য, আর মার্ক্সের মতে বিচ্ছিন্নতা দূর করতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য। সুতরাং দুজন চিন্তাবিদের ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে এটা বলাই যথেষ্ট নয়; বিচ্ছিন্নতা এবং অ্যানোমি দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা।

ক্রিয়াশীলতা তত্ত্ব ও ধর্ম

Religion is the sigh of the oppressed creature, the sentiment of a heartless world and the soul of soulless conditions It is the opium of the people —— Karl Marx

We must choose between God and Society —— Durkheim

ক্রিয়াশীলতা তত্ত্ব নতুন নয়; এর আছে দীর্ঘ ইতিহাস। প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানগুলোতে ক্রিয়াশীলতা তত্ত্বের ব্যবহার বহুদিন ধবেই চলে আসছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টটল তার সামাজিক-রাজনৈতিক তত্ত্ব দিতে গিয়ে চুক্তিবাদের বিরোধিতা করে সমাজ বা 'সমাজরাষ্ট্রকে' জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। সমাজকে তিনি যন্ত্র না ভেবে বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এক জৈব ব্যবস্থা বলে মনে করেছেন। মধ্যযুগীয় অনেক ঈশ্বরতাত্ত্বিক লেখক আরিস্টটলেব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হলেও 'রাষ্ট্র'কে ঈশ্বর সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ একে 'যন্ত্র স্বরূপ' দেখেছেন। আধুনিককালের ক্রিয়াশীলতা তত্ত্ব (Functionalism) অথবা কাঠামো ক্রিয়াশীলতা তত্ত্ব (Structural Functional Theory) জীববিজ্ঞানগুলো থেকে অনেক মালমশলাই সংগ্রহ করেছে। তবে পূর্ববর্তী জৈবিক মতবাদ সমগ্রের সঙ্গে অংশের যে অনিবার্য সামগ্রিক সংহতির কথা বলেছে এখানে অবশ্য তা বর্জিত হযেছে। নির্দেশ্যবাদকে বর্জন করে আন্তঃপ্রক্রিয়ার বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এখন ক্রিয়াশীলতাবাদ এই কথাই বলে যে সমাজ একটা সমগ্র এবং বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্কে ও সমন্বয়ে গঠিত। ক্রিয়াশীলতাবাদ সমাজকে একটা আত্মসংরক্ষণশীল ও আত্মবিকাশশীল ব্যবস্থা হিসেবে দেখে। এর মধ্যে রয়েছে পর্যবেক্ষিত সামাজিক সম্পর্ক এবং নিয়মমাফিকতা। ক্রিয়াশীলতাবাদ আসলে একটি সমাজতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত যার উদ্দেশ্য হল সমাজ ও সামাজিক সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে তার বিভিন্ন উপাদান ও সংস্কৃতি ধাঁচ দিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে তার ফলাফলের ওপর গুরুত্ব দেয়া। এখানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একক হল সমাজ এবং তার বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক ক্রিয়াকে সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা। অর্থাৎ যেকোন সংগঠনের একটা কাঠামো আছে এবং কাঠামোর, এক বা একাধিক কার্য আছে। বিষয়টাকে যান্ত্রিক দিক থেকেও ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন একটা ঘড়ি; তার বেশ কয়েকটি অংশ আছে। প্রত্যেকটি তার কার্য করে; এবং অংশগুলোর সঙ্গে সমগ্রের সুসমন্বয়েই ঘড়িটি চালু থাকে। একটি অংশের কোন পরিবর্তন হলে অপর অংশগুলো প্রভাবিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্রও প্রভাবিত হবে। ক্রিয়াশীলতাবাদীরা সমাজ সম্পর্কেও এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে চান। ক্রিয়াশীলতাবাদের মৌলিক বিষয়কে Francesca M. Cancian সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

an interest in relating one part of a society or social system to another part or to some aspect of the whole

ক্রিয়াশীলতাবাদ সমাজকে একটা ব্যবস্থা বা প্রণালী বলে মনে করে। এই বিশ্লেষণে বিভিন্ন অংশকে সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত করেই তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়। পবিবার, ধর্ম, সামাজিক স্তরবিন্যাস প্রভৃতি বিষয়কে সামাজিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে দেখতে হবে, তাদের স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে তারা কি ভূমিকা পালন করে, বা কি অবদান রাখে বা কী ধরনের ক্রিয়া করে তা দিয়েই এদের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে হবে।

পূর্ববর্তী ক্রিয়াশীলতাবাদী মানবদেহ ও সমাজদেহের সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন। মানব দেহের বা জীবদেহের যেমন বিভিন্ন অঙ্গ সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত এবং সমগ্রের রক্ষাকল্পে বিভিন্ন কার্য করে থাকে, সমাজের অংশগুলোও তই করে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ও পরস্পবের ওপর নির্ভরশীল হয়ে মিলিতভাবে একটি উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে। আবার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেগুলো অসংখ্য কোষের সমন্বয়। এই কোষগুলোব আবার বিভিন্নতা ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এভাবে দেখা যায় যে ছোট থেকে বড়ো, বড়ো থেকে আরো বড়ো এভাবে সেগুলো পর্যায়ক্রমে সাজানো আছে। এদের প্রত্যেকের নিজ নিজ নির্দিষ্ট কার্য আছে, তেমনি অপর দিকে সমবেতভাবে সমগ্রদেহের সংরক্ষণের জন্য কার্য করে। সমাজদেহও একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। অসংখ্য ব্যক্তি নিয়ে সমাজ গঠিত। আবার এই সব ব্যক্তির সমন্বয়ে বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠান গঠিত এবং এদের নিয়ে আবার সমাজ দেহ গঠিত। প্রাণিদেহের একটা অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল তার সংরক্ষণ; বিভিন্ন কার্যের মধ্যে প্রাণী-বিশেষ এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে। সমাজেব পক্ষেও একই কথা বলা চলে। সমাজও তার বিভিন্ন অংশের মাধ্যমে একটা সাধারণ লক্ষ্য পালনেব চেষ্টা করে - সমাজ জীবনের ধারাকে অব্যাহত রাখে বা অক্ষুন্ন বাখে। ক্রিয়াশীলতাবাদীরা একথাই জোর দিয়ে বলতে চান যে জীবদেহের অংশগুলো যেমন অপর অংশের সঙ্গে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত, সমাজসমগ্রতেও অংশগুলো পরস্পরের সঙ্গে এবং সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত। সমগ্রের সঙ্গেই অংশগুলোযুক্ত তাই নয়, অংশগুলোও নিজেদের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সংযুক্ত। প্রতিটি অংশই কোন না কোন কর্ম সম্পাদন করে। কতকগুলো নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটায়।

এইসব প্রয়োজন বা কার্যকেই বলে সমাজের কর্মগত প্রয়োজনীয়তা, যেমন ডেভিস ও মুর বলেছেন, প্রতিটি সমাজসমগ্রের টিকে থাকার অপরিহার্য ভিত্তি হল সামাজিক স্তরবিন্যাস। কিংবা জর্জ পিটার মারডকের মতে, প্রতিটি মানবসমাজেই পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্যণীয়। এর থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সামাজিক স্তর বিন্যাস বা পরিবারের অস্তিত্ব সমাজসংরক্ষণের অন্যতম সামাজিক ব্যবস্থাপনা। যেমন পরিবারের একটা কাঠামো এবং তার বেশ কয়েকটি কার্য (বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি করা এবং প্রজন্মের মধ্যে সামাজিকীকরণের কর্ম সম্পাদন করা) দেখতে পাওয়া যায়।

মেরিয়ন জে. লেভি ক্রিয়াশীলতাবাদের আর একটি বিকল্প ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। তিনি সমাজের অবনতি বা অসুস্থতার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছেন, যাতে এই অসুস্থতা বা অবনতি না ঘটে তার জন্য সমাজের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন তিনি বলেন, যদি

সমাজসদস্যরা প্রত্যেকেই নির্মূল হয়ে যায়, কিংবা তারা যদি অক্রিয়, নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন হয়ে পড়ে, তাহলে সমাজের অবনতি এমনকি ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা ঘটবে। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়, পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাহলে সামাজিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে।

সুতরাং সমাজকে টিকে থাকতে হলে, এইসব ঘটনা যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা করতে হবে; এসব ঘটনাকে বাধা দেবার জন্য উপায় ও পদ্ধতি বের করতে হবে। এই সব উপায় ও পদ্ধতি সমাজের পক্ষে কার্মিক প্রয়োজনীয়তা। যাতে সমাজের সব সদস্য অবলুপ্ত না হয় তার জন্য নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি করতে হবে, সদস্যদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করতে হবে, ব্যক্তিদের মধ্যে পৃথকীকরণ করে তাদের ভূমিকা নির্ধারণ করতে হবে। কোন কোন ব্যক্তিকে অবশ্যই খাদ্য উৎপাদনের ভূমিকা পালন করতে হবে। সমাজকে সামগ্রিকভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য নানাধরনের ব্যক্তিকে নানা ধরনের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। ভূমিকা নির্দিষ্টকরণের সাথে সাথে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থাও করতে হবে যাতে সমাজসদস্যরা প্রত্যেকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হতে পারে। সমাজের অসুস্থতা ও অবনতির কথা উল্লেখ করে আসলে মেরিয়ন লেভি সমাজসমগ্রের সংরক্ষণের জন্য কি কি ব্যবস্থাগ্রহণ করা উচিত তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আধুনিক ক্রিয়াশীলতাবাদের অন্যতম লেখক ট্যালকট্ পার্সনস্ সমাজকে একটা সুসংগঠিত ব্যবস্থা হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে যেকোন ব্যবস্থারই চারটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত আছে ঃ ১) অভিযোজন; ২) উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জন; ৩) সংহতি; ৪) ধাঁচ সংরক্ষণ। পার্সনস্ এর মতে টিকে থাকার জন্য, পরিবেশের ওপর সমাজের নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। ন্যুনতম প্রয়োজন মেটাবার জন্য খাদ্য ও আশ্রয় অবশ্যই দরকার। প্রতিটি সমাজেরই একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে; এবং তা অর্জনের জন্য কর্মকে পরিচালিত করতে হয়। সরকারী বা বেসরকারী নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে এটা করা সম্ভব। সংহতি বলতে বোঝায় দ্বন্দ্বের মীমাংসা; বা সামাজিক অংশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়। ধাঁচ সংরক্ষণ বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট মূল্যবোধের সংরক্ষণ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য দিয়ে সামাজিক মূল্যবোধ সংরক্ষিত হয়। যেমন পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্ম। তবে পার্সনস্ সবথেকে গুরুত্ব দিয়েছেন ধর্মকে কারণ তাঁর মতে 'সামাজিক মূল্যবোধের উৎস হল ধর্ম'। উপরের চারটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাজকে জানা যায়, চেনা যায় এবং ব্যাখ্যা করা যায় বলে পার্সনস্ এর অভিমত।

ট্যালকট পার্সনস্ যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন তা দিয়েই কি সমাজদেহের প্রয়োজন উপলব্ধি করা যায়? জীবদেহের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলোকে আমরা সবসময়েই বুঝতে পারি কিন্তু সমাজ সমগ্রের জন্য কী প্রয়োজন তা কি আমরা সহজে নির্দেশ করতে পারি? বুর্জোয়া সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্য কিছু সাধারণ মৌলিক প্রয়োজনীয়তা থাকে; কিন্তু দুটি সমাজ তো একরকমের নয়। সুতরাং সমাজসমগ্রের চরিত্র এবং তাদের অংশগুলোর কার্যাবলী এক রকম হতে পারে না। দুটি সমাজ গুণগতভাবেই ভিন্ন ধরনের। সমাজ মরে যায় না; সে পরিবর্তিত হয়; সম্পূর্ণ নতুন সমাজেরও সৃষ্টি হয় না কিন্তু পরিবর্তিত সমাজের জন্য অংশগুলোর কর্মের মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের কর্মগত ও চরিত্রগত পার্থক্য আছে।

অন্যভাবে ক্রিয়াশীলতাবাদকে দেখা যেতে পারে। কোন সমাজের টিকে থাকার জন্য

অংশগুলোর সংহতি দরকার; সমগ্রের সাথেও সম্পৃক্তির প্রয়োজন। অংশগুলোর মধ্যে এবং অংশগুলোর সঙ্গে সমগ্রের সংহতি না থাকলে সমাজ টিকে থাকতে পারে না। ক্রিয়াশীলতাবাদ তাই 'সমাজ শৃঙ্খলা' এবং সমাজসংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে একথাই বলে যে অংশগুলোর মৌলিক কাজ হল ব্যবস্থা সংরক্ষণ। বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা ও তথ্য (দুর্খায়েমের ভাষায়) যেমন পরিবার, ধর্ম প্রভৃতি সামাজিক সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। যেমন দুর্খায়েম ও ট্যালকট পার্সনস্ এর মতে ধর্ম সামাজিক মূল্যবোধকে প্রকাশ করে এবং সমাজ সদস্যের ওপর একধরনের চাপ সৃষ্টি করে যাতে সকলেই 'ধর্মীয় মূল্য' যা আসলে সামাজিক মূল্য - মেনে চলে।

ক্রিয়াশীলতা তত্ত্বের মৌলিক প্রত্যয় হ'ল এটাই প্রমাণ করা যে ব্যবস্থা কেন এবং কীভাবে টিকে আছে বা টিকে থাকতে পারে। কোঁৎ, দুর্খায়েম, হার্বার্ট স্পেনসার, ম্যালিনোস্কি, র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন, পার্সনস্, মুর ও ডেভিস, ম্যারিয়ন লেভি প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে সামাজিক ধাঁচের রক্ষাকল্পেই তাঁদের ক্রিয়াশীলতা তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। রবার্ট মার্টন অবশ্য ক্রিয়াশীলতাবাদের ভিন্নতর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে প্রত্যেকেই সামাজিক ক্রিয়ার (Social Function) ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। নেতিবাচক কর্ম (dysunction) থেকে ইতিবাচক কর্মের (eufunction) ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বিস্তৃত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবার ক্রিয়াশীলতাবাদের মৌলিক প্রত্যয়গুলোর একটা সার সংকলন করা যেতে পারে ঃ

ক) ক্রিয়াশীলতা তত্ত্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা কাঠামো তৈরী করতে চায়;

খ) একটা ব্যবস্থা অংশগুলোর শুধুমাত্র যোগফল নয়; তার থেকে অতিরিক্ত; ফলে অংশের থেকে সমগ্রের/ব্যবস্থার স্বাধীন সত্তা আছে;

গ) ব্যবস্থার উপাদানগুলো কার্মিক দিক থেকে পরস্পর সংযুক্ত; প্রত্যেকটি অংশই সমগ্রের সংরক্ষণের জন্য তার নির্দিষ্ট কর্ম করে থাকে;

ঘ) প্রতিটি উপাদানই ব্যবস্থা সংরক্ষণে, অবনতিতে, পরিবর্তনে বা ভাঙ্গনে ইতিবাচক বা নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে;

ঙ) প্রত্যেকটি ব্যবস্থাই কতকগুলো উপাদানে সম্পর্কিত জৈব সমগ্র;

চ) প্রত্যেকটি সমাজই আপেক্ষিকভাবে আত্মনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা; নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারে, বিকাশ করতে পারে;

ছ) ক্রিয়াশীলতাবাদীরা সমাজকে স্থিতিশীল একক বলে চিহ্নিত করেছেন কিন্তু তারা সামাজিক ভারসাম্যের (Social equilibrium) পরিবর্তে গতিশীল সামাজিক ভারসাম্য (dynamic social equilibrium) প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন;

জ) ক্রিয়াশীলতাবাদীরা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন;

ঝ) সামাজিক ব্যবস্থার প্রক্রিয়া নির্ভর করে ব্যক্তিসদস্যের সাধারণ উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের সাধারণ ঐক্যের ধারণার ওপর। ক্রিয়াশীলতাবাদীরা ব্যক্তির প্রতি উদাসীন নন; সমাজসমগ্রের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে তারা ব্যক্তিত্বের বিনাশ বা অবলুপ্তির কথা বলেন নি; ব্যক্তিকে সমাজের মধ্যে বিলীন করে দিয়ে পরিচয়হীন করেন নি।

ঞ) ক্রিয়াশীলতাবাদীরা প্রায় সকলেই (দুর্খায়েমের থেকে মার্টন পর্যন্ত) সমাজসংহতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বলেছেন সামাজিক সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ অংশগুলোর কাজ

সেই সংহতি বা সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য কর্ম করে যাওয়া। এই কাজ শুধু প্রয়োজনীয় নয়, অপরিহার্যও।

ট) ক্রিয়াশীলতাবাদ একদিকে সমাজ বিশ্লেষণের পদ্ধতি অপর দিকে একটা পরিপ্রেক্ষিত (Perspective) বা তত্ত্ব। জর্জ হোমানস্ মনে করেন যে ক্রিয়াশীলতাবাদ সমাজ আলোচনার এক বিশেষ পদ্ধতি, তত্ত্ব নয়। কিন্তু অ্যালেক্স ইংকলস্ একে একটা তত্ত্ব বা পরিপ্রেক্ষিত হিসেবেও দেখেছেন।

ক্রিয়াশীলতাবাদ জোর দিয়েছে সমাজের ওপর, সমাজব্যবস্থার ওপর। একারণেই ব্যক্তি বা অপরাপর সংঘগুলো যেন স্বাতন্ত্র্যহীন, তারা যেন সকলেই সমগ্রের হাতে বলিপ্রদত্ত। যেন সেই গানের মতো, "তুমি যন্ত্র, আমি যন্ত্রী, তুমি ঘর, আমি ঘরামি, তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।" অথবা সংঘ ও ব্যক্তি যেন জগন্নাথরূপী সমাজের দড়ি টানছে এবং কখনো বা পিষ্ট হচ্ছে। তারা নির্দেশিত নিয়ন্ত্রিত, যেন যন্ত্রের নাটবল্টুর মতো। এ ধরনের সামাজিক তত্ত্ব সামাজিক বিশ্বকে Reified করে তুলেছে। সামাজিক বিশ্বকে যেন প্রাকৃতিক বিশ্বে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ক্রিয়াশীলতাবাদীরা সমাজকেই সক্রিয় করে তুলেছেন আর যারা সমাজকে গড়েছে সেই সমাজ সদস্যদের করে তুলেছেল নিষ্ক্রিয়, সমাজ প্রণালীর হাতের ক্রীড়নক।

তাছাড়া ক্রিয়াশীলতাবাদে, বিশেষ করে ট্যালকট পার্সনস্ এর তত্ত্বে সংহতি, ঐক্যমত, ধাঁচ সংরক্ষণ প্রভৃতিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, পরিবর্তন, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি এ তত্ত্বে অনুপস্থিত। তাছাড়া ক্রিয়াশীলতাবাদ শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার প্রশ্নকে সুকৌশলে এড়িয়ে গেছে। যেন সমাজে শ্রেণী নেই, সংগ্রাম নেই, বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রিয়াকর্ম নেই, শ্রেণী সমূহের মধ্যে সহযোগিতার কথা বলা হলেও দ্বন্দ্বের কথা নেই। 'গতিশীল ভারসাম্য তত্ত্বও' আসলে সমাজ সংরক্ষণের তত্ত্ব, সেই কারণেই রক্ষণশীল।

উপরন্তু, ক্রিয়াশীলতাবাদীরা, যেমন পার্সনস্ নির্দিষ্টমূল্যবোধ ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করেছেন। মূল্যবোধগুলো সমাজের দ্বারা স্বীকৃত ও সকলের দ্বারা পালিত বলে তিনি দাবিও করেছেন। কিন্তু এই মূল্য কিসের মূল্য, কাদের মূল্য? এটা তো ঘটনা যে সমাজে অর্থনীতিগতভাবে শক্তিশালী শ্রেণী বা শ্রেণীগুলো তাদের ইচ্ছা, স্বার্থকে মতাদর্শ ও সকলের জন্য গৃহীত মূল্যবোধ হিসেবে উপস্থিত করে এবং তাতে সার্বজনীনতার রং দিয়ে সমাজের অপরাপর শ্রেণী বা গোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেয়। সকলকেই তা মেনে নিতে নির্দেশ দেয় অথবা যাতে সকলে তা মেনে নেয় তার জন্য মতাদর্শগত প্রচার চালায়। মার্ক্স ও এঙ্গেলস The German Ideology গ্রন্থে বলেছিলেন ঃ

> The ruling ideas are the ideas of ruling class.

ঠিক একইভাবে আধুনিক ক্রিয়াশীলতাবাদী পার্সনস্ এর মূল্যবোধ সংক্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে Alvin Gouldner প্রশ্ন তুলেছেন ঃ

> While stressing the importance of the ends and values that men pursue,Parsons never asks whose ends and values these are. Are they pursuing their own ends or these imposed upon them by others?

ক্রিয়াশীলতা তত্ত্ব শুধু তত্ত্ব ও পদ্ধতি নয়; এটা বুর্জোয়া শাসনের বৈধ মতাদর্শ হিসেবেও

কাজ করে। এই তত্ত্বের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা - বিভিন্ন অংশের মধ্যে এমন ধরনের সমন্বয় গড়ে তোলা যাতে করে ব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হতে না পারে। যথাসম্ভব দ্বন্দ্বকে সীমার মধ্যে রাখাই এর উদ্দেশ্য। মানবদেহের সঙ্গে সমাজদেহের সাদৃশ্য বর্ণনা করার মৌলিক উদ্দেশ্য হ'ল মানবদেহের 'স্বাস্থ্য' রক্ষা করা। আসলে 'ধনতান্ত্রিক সমাজের স্বাস্থ্য' রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য। এবং দ্বন্দ্বমূলক 'রোগের' উৎপত্তি যাতে না ঘটে তার যথাসাধ্য তাত্ত্বিক উপাদান যোগানো। এই মতবাদ সমাজকে স্থির ব্যবস্থা হিসেবে দেখে; সেইজন্যই প্রায় সার্বজনীন রূপ গ্রহণ করে। সমাজব্যবস্থাকে প্রক্রিয়া হিসেবে না দেখে একে অভিহিত করা হয়েছে 'শৃঙ্খলা' বলে। সমাজ শৃঙ্খলা, সামাজিক ঐক্য, ঐক্যমত প্রভৃতি আসলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার তাত্ত্বিক অস্ত্র যোগায়। ক্রিয়াশীলতা তত্ত্বে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে - তার প্রকৃত প্রকৃতি সম্পর্কে কোন গভীরতর আলোচনা থাকে না।

ক্রিয়াশীলতাবাদের সাধারণ ব্যাখ্যার আলোকে দুর্খায়েমের ক্রিয়াশীলতাবাদ এবং তৎপরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ধর্ম সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার আলোচনা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে ক্রিয়াশীলতাবাদের উৎস প্রাচীন। তবে আধুনিক ক্রিয়াশীলতাবাদের শুরু হয়েছে কোঁৎ এর Consensus universalis বা সার্বজনীন ঐক্যমতের তত্ত্ব থেকে। হার্বার্ট স্পেনসারের সমাজদেহ ও জীবদেহের প্রতিতুলনা এক্ষেত্রে এক অবদান হিসেবেই স্বীকৃত। কিন্তু স্পেনসার হলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আঙ্গিক মতবাদে বিশ্বাসী এবং সে কারণেই তিনি ব্যক্তির স্বার্থ ও প্রয়োজনীয়তার ব্যক্তিকেন্দ্রিকভাবে এই মতবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দুর্খায়েম স্পেনসারের ব্যক্তিকেন্দ্রিক আঙ্গিক মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং সমাজসমগ্রকে ব্যক্তির ওপর স্থান দিয়েছেন।

দুর্খায়েম সামাজিক বিভিন্ন উপাদানের ওপর 'ব্যবস্থার' প্রাধান্যের কথা বলেছেন। সমাজতত্ত্বের মৌলিক বিষয় 'সামাজিক তথ্যের' ব্যক্তি অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্য আছে বলে তিনি মনে করেন। ব্যক্তির ওপর এগুলো বাইরে থেকে (externally) চাপ সৃষ্টি করে বা ব্যক্তিকে সমাজস্বীকৃত নিয়ম, নীতিমালা ও মূল্যবোধ মেনে নিতে বাধ্য করে। দুর্খায়েম সামাজিক ঘটনাবলী বা তথ্যগুলোকে একদিকে কার্যকারণ দিয়ে আবার অপর দিকে 'সামাজিক প্রয়োজন' বা 'কর্মগত' দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। সামাজিক প্রপঞ্চের কারণ ও ফলাফলের মধ্যে তিনি পার্থক্যও করেছেন ঃ

> To show how a fact is useful is not to explain how it originated or why it is what it is. The uses it serves presupposes the specific properties characterising it but do not create them.

কোন একটি সামাজিক ঘটনা বা তথ্য সামাজিক প্রয়োজন না মিটিয়েও টিকে থাকতে পারে অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তাকে অতিক্রম করে অস্তিত্বশীল থাকতে পারে অথবা কোন সামাজিক ঘটনার কর্মগত দিকের পরিবর্তনও হতে পারে। খ্রীষ্টধর্ম মধ্যযুগে সামাজিক জীবন সংরক্ষণে এবং ব্যক্তির ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছিল আধুনিক যুগে সে ধরনের প্রাধান্যকারী ভূমিকা তার নেই। কিন্তু খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসকাঠামোর কোন পরিবর্তন হয়নি।

অর্থাৎ সামাজিক ঘটনা হিসেবে তার অস্তিত্ব আছে কিন্তু বিশেষ কর্মগত ভূমিকা আর পালন করে না, বা করতে পারছে না। দুর্খায়েম তাই সামাজিক ঘটনা বিশ্লেষণে দুটি দিকের মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন ঃ ১) কার্যকারণ দিক; ২) কার্মিক দিক। তবে দুটি দিককেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

> When then, the explanation of a social phenomenon is undertaken, we must seek separately the efficient cause which produces it and the function it fulfils.

এভাবে দুর্খায়েম ক্রিয়াশীলতাবাদের যুক্তি বিশদায়িত করেছেন এবং বিভিন্ন সামাজিক ঘটনার কারণ ও ফলাফল সুসংবদ্ধভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রমবিভাগ, সামাজিক সংহতি, আত্মহনন, নৈতিকতা, ধর্ম প্রভৃতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি ক্রিয়াশীলতাবাদকে পদ্ধতিগত ও তাত্ত্বিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কোঁৎ এর সামাজিক বিবর্তনবাদ, স্পেনসারের বিবর্তনবাদ এবং বেন্থাম ও মিলের উপযোগিতাবাদকে তিনি সমাজ আলোচনা ক্ষেত্রে যুক্তিপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক বলে মানতে পারেন নি কিন্তু দুর্খায়েম ক্রিয়ার (Function) ধারণা জীববিদ্যা থেকেই গ্রহণ করেছেন। একটা জীবদেহকে ব্যাখ্যা করতে গেলে তার শারীরবিদ্যাগত প্রক্রিয়া বা নানা ধরনের ক্রিয়া দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হয়। এই বিষয়কে সামাজিক বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তিনি বলতে চান যে সামাজিক প্রপঞ্চ বা কোন সামাজিক ঘটনার কার্যাবলী নির্ধারিত হয় তার সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে এবং সমগ্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের ভিত্তিতে। একটা সামাজিক ঘটনা টিকে থাকে এ জন্যই যে তা নিশ্চিতভাবেই কোন না কোন সামাজিক ক্রিয়া (Social Function) সম্পাদন করে। সামাজিক সংগঠনের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই সমাজস্থ মানুষের/ব্যক্তির কোন না কোন প্রয়োজন মেটায়। শ্রমবিভাগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে দুর্খায়েম বলেছেন, একমাত্র anomic অবস্থা ছাড়া প্রতিটি ক্ষেত্রে সে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া নেতিবাচকভাবেও anomie তার কার্য সম্পাদন করে। অপরাধ প্রসঙ্গে বলতে গিয়েও দুর্খায়েম তাকে দেখেছেন সামাজিক ভূমিকা পালনকারী হিসেবে। দুর্খায়েম লিখেছেন ঃ

> *Criminal behaviour, like religion must fulfil a particular need because it has always existed - (it is) an integral part of all healthy society.*

দুর্খায়েম বলেছেন, প্রতিটি সমাজই একটা 'সমগ্র', আর এই সমগ্র গড়ে ওঠে অংশগুলোর অন্তর্জাত পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। প্রতিটি অংশই সমগ্রের সাথে কোন না কোনভাবে সংযুক্ত; সমগ্র ছাড়া অংশ মূল্যহীন। যে সদস্যরা সমাজের সৃষ্টি করেছে সেই সদস্যদের থেকে সমাজের এক নিজস্ব বাস্তবতা আছে। সমাজসদস্যরা সামাজিক ঘটনা দ্বারা কমবেশী নির্ধারিত এবং *বাহ্যিকভাবে নিয়ন্ত্রিত (externally constrained) এমনকি আমি কি হতে চাই, কি* করতে চাই, কি বলতে চাই, কি আদর্শ অনুসরণ করতে চাই, তার পেছনেও থাকে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত উত্তরাধিকার। সংক্ষেপে মানুষের কাজ করা, চিন্তা করা, অনুভব করা সবই সমাজনিয়ন্ত্রিত। 'Do what the society makes you do, feel what the society makes you feel, think what the society makes you *think*'. কর্ম, চিন্তা, অনুভব সবই সমাজকর্তৃক নির্দেশিত। মানুষের বিশ্বাস কাঠামো, নৈতিক

বিধিবিধান, ধর্মভাবনা সবকিছুই এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রবাহিত হয়ে থাকে। সুতরাং ব্যক্তির চেতনা তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং সাধারণভাবে সমাজস্বীকৃত বিশ্বাস, আবেগ, নৈতিকতা ব্যক্তির চেতনাকে নির্ধারণ করে। তিনি বলেছেন সামাজিক ঘটনা বা তথ্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিন্তু তাদের রয়েছে 'স্বাতন্ত্র্য' অবস্থান। সমাজ তার কাছে এক প্রণালী যা নিজেকে সংরক্ষণ করার জন্য নিজস্ব নিয়ম মেনে চলে।

দুর্খায়েম সামাজিক ঘটনার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দুটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। প্রথমত সামাজিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করা, দ্বিতীয়ত, তার উৎস বা উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা। তাঁর মতে,

> The determining cause of a social fact should be sought among the social facts preceeding it and not among the states of individual consciousness.

যেমন আত্মহননের কারণ খুঁজতে হবে সামাজিক ঘটনার মধ্যে; ব্যক্তির মানসিক আচরণ দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সামাজিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে সমাজে তার প্রয়োজনীয়তা বা কার্মিক দিক দিয়েও ব্যাখ্যা করতে হবে। একটা সামাজিক ঘটনা বা তথ্য টিকে থাকে সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা দিয়ে। ***কোন ঘটনার অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে সে সমাজের জন্য - তার সংরক্ষণে ও উদ্বর্তনে - কোন না কোন কর্ম সম্পাদন করছে।***

দুর্খায়েমের অনেক রচনাই এই ক্রিয়াশীলতাতত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত। প্রতিটি সমাজেরই কার্মিক দিক আছে; বিশেষ করে সামাজিক শৃঙ্খলা বা সংহতির প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুর্খায়েম তার সমাজতত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন দিয়েই শুরু করেছিলেন, 'কীভাবে ব্যক্তিবর্গ সুসংগঠিত সমাজের মধ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকে?' তিনি সমাজ শৃঙ্খলা ও সমাজসংহতির প্রশ্নে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকের উল্লেখ করেছেন, তা হল সমষ্টিগত চেতনার (conscience collective) প্রশ্ন। সকলের জন্য একই ধরনের বিশ্বাস, মূল্যবোধ কীভাবে তৈরী হবে? আর নৈতিক বিষয়ে ঐক্যমত ছাড়া যে সামাজিক সংহতি অসম্ভব তা সহজেই বোঝা যায়। নৈতিকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি বা সংঘ যদি তাদের নিদির্ষ্ট দায়দায়িত্ব পালন না করে তবে সহযোগিতা বা আদানপ্রদান বিষয়টিই অনুপস্থিত থাকবে। সমাজসমগ্র ধারণাই তখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে। পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে যদি ব্যক্তিস্বার্থ প্রাধান্য পায় অথবা দুর্খায়েম যেমন বলেন, যদি সকলেই সকলের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তাহলে দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। দুর্খায়েম লিখেছেন ঃ

> For where interest is the only ruling force each individual finds himself in a state of war with every other.

সমষ্টিগত বিবেক ব্যক্তিকে সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী কর্ম করতে নির্দেশ দেয়; সমষ্টিগত *বিবেক/চেতনা যেহেতু সামাজিক ঘটনা, সেহেতু ব্যক্তির থেকে তার থাকে স্বাতন্ত্র্য।* দুর্খায়েমের ভাষায় ঃ

> Society has to be present in the individual.

ক্রিয়াশীলতা তত্ত্বের পদ্ধতি প্রয়োগ করে দুর্খায়েম ধর্মকে সামাজিক সমষ্টিগত চেতনার প্রকাশ হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। ধর্মকে দুর্খায়েম এক অন্যতম সামাজিক তথ্য হিসেবে দেখেছেন। সমাজ ধর্মের ভিত্তি রচনা করে; দুর্খায়েমের ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা তাই সমাজতাত্ত্বিক।

Elementary Forms of Religious Life গ্রন্থে দুর্খায়েম ধর্মের এক বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, এর উৎস, প্রকৃতি ও সামাজিক জীবনে এর প্রভাবের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ধর্মের কোন অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা তিনি দেন নি। ধর্মের অস্তিত্ব সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার কারণেই; সেদিক থেকে ধর্মের কতকগুলো সামাজিক কর্ম আছে। টাইলর ধর্মকে 'ব্যক্তিক' দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। ম্যাক্স মুলারের মতে ধর্ম ভীতি থেকে উৎপত্তি হয়েছে। দুর্খায়েম ধর্মকে সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ধর্ম সামাজিক ব্যবস্থা সংরক্ষণের অন্যতম মাধ্যম। দুর্খায়েম ধর্মের এক ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ

> A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, things that set apart and forbidden beliefs and practices which unite into one single moral community, called a church, all those who adhere to them.

এর সংক্ষিপ্ত অর্থ হল ধর্ম এক সমষ্টিগত বা সামাজিক প্রপঞ্চ যা বিশ্বাস ও কর্ম প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে এসেছে। জনগণের বিশ্বাস ও কার্যাবলীর মধ্য দিয়েই ধর্ম প্রকাশিত ও প্রতিফলিত হয়। ধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দুর্খায়েম মানুষের সামাজিক কর্মকে দুভাগে ভাগ করেছেন: ১) পবিত্র কর্ম ২) অপবিত্র বা ধর্মনিরপেক্ষ কর্ম।

পবিত্র বিষয় হল সেইসব বিষয় যার সঙ্গে পার্থিব বা অপবিত্র বা ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক কাজকর্মের কোন সম্পর্ক নেই। পবিত্র বিষয়ের ক্ষেত্রে একধরনের নিষেধ বা সামাজিক ট্যাবু যুক্ত থাকে অর্থাৎ কী করণীয়, কী করণীয় নয়, ইত্যাদি ব্যাপার সেখানে সবসময়ই উপস্থিত। ধর্ম হল মানুষের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধাজড়িত বিষয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্ত থাকে একধরনের কর্তৃত্ব চেতনাও। পবিত্রতার সামাজিক চরিত্র থাকে, না থাকলে কর্তৃত্ব, ভালবাসা শ্রদ্ধা এবং বাধানিষেধের ব্যাপার আসতেই পারে না। সংক্ষেপে ধর্ম হল পবিত্র জিনিস সম্বন্ধে ঐক্যবোধ: কতকগুলো বিশ্বাস বা বিশ্বাসকাঠামো এবং আচার অনুষ্ঠানের সম্মিলিত রূপ। এথেকে আর একটি জিনিস আসে যে ধর্ম কতকগুলো জিনিসকে অপবিত্র বা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। তবে ধর্ম যেভাবে পবিত্র বা অপবিত্রের পাথর্ক্য করে তার এক ভিন্ন অর্থ আছে।

> By sacred things one must not understsnd simply those personal things which are called Gods or Spirits, a rock, a tree, a spring, a pebble, a piece of wood, a house, in a word, anything can be sacred.

. অর্থাৎ পবিত্র জিনিস বলতে শুধুমাত্র ঈশ্বরের বা আত্মার মত ব্যক্তিগত জিনিস বোঝায় না, একটা পাথর, একটা বৃক্ষ, একটা ঝর্ণা, একটা নুড়ি, এক টুকরো কাঠ, একটা গৃহ, সবকিছুই পবিত্র হতে পারে। নুড়ি বা গাছের বা কাঠের কোন নির্দিষ্ট গুণাবলী নেই যাতে করে এরা পবিত্র হতে পারে। পবিত্র জিনিস আসলে প্রতীকের (symbols) কাজ করে, সেগুলো কোন না কোন অর্থ বহন করে, কোন কিছুকে প্রকাশ করে, কোন কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং সমাজে ধর্মের ভূমিকা বুঝতে হলে পবিত্র প্রতীকের সঙ্গে সে যে অর্থ প্রকাশ করে তার সম্পর্কে বুঝতে হবে। প্রাচীন সব ধর্মে এইসব প্রতীকের ব্যবহার ছিল। হিন্দু ধর্মের এরকম অজস্র প্রতীক

ব্যবহার রয়েছে। পাথর পুজো থেকে শুরু করে বৃক্ষপুজো সবই এখানে দেখতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টধর্মের 'ক্রুশ' ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এমনিতে এর কোন মূল্য বা পবিত্রতা নেই। একে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে তার মধ্যে পবিত্রতা আরোপ করা হয়েছে।

তাহলে, অপবিত্রতা বা পার্থিব বিষয়গুলো কি? যার সঙ্গে পবিত্র বিষয় যুক্ত নেই সেগুলো পার্থিব বা অপবিত্র। প্রতিদিনের পার্থিব বিষয়সমূহ, প্রতিদিনের পার্থিব পেশাসমূহ, আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বার্থ বিষয়ক সবকিছুই অপবিত্র। সেজন্যই মানুষ কোন কাজ অপবিত্র মনে করলে তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য নানারকম ধর্মীয় কাজে অর্থাৎ পবিত্র কাজে অংশগ্রহণ করে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে। শুদ্ধিকরণের বিষয়টি প্রায় সব ধর্মেই দেখতে পাওয়া যায়। সামাজিক সমষ্টিগত কাজই নির্ধারণ করে কোনটা পবিত্র আর কোনটা অপবিত্র। পার্সনস দুর্খায়েমের ধর্ম সম্পর্কে মতামত প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

> Sacred things are distinguished by the fact that men do not treat them in a utilitarian manner, do not as a matter of course use them as a means to the ends to which by virtue of these intrinsic properties they are adopted, but set them apart from other profane things.

পবিত্রতা এই শব্দের মধ্য দিয়ে আসলে একধরনের 'সমষ্টিগত শক্তি' (collective force) প্রতিফলিত হয়; ব্যক্তিগত চেতনা অতিক্রম করে এক সংঘ চেতনা বা সমাজচেতনার আবির্ভাব হয়। এজন্য দুর্খায়েম ধর্মকে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠরূপ বা চেতনার চেতনা (consciousness of consciousnesses) বলে অভিহিত করেছেন।

ধর্ম প্রসঙ্গে সংজ্ঞার মধ্যে গীর্জা শব্দটির উল্লেখ আছে। গীর্জা বলতে দুর্খায়েম খ্রীষ্ট ধর্মালম্বীদের গীর্জাকে বোঝান নি। গীর্জা হল একধরনের ধর্মীয় সংগঠন। এই সংগঠনই মানুষের ধর্মীয় জীবনকে সংগঠিত করে। সেই দিক থেকে প্রাচীন/আদিম জনগণের মধ্যেও সংগঠন চেতনা বা সামাজিক চেতনা ছিল। ধর্মীয় প্রধানগণ ধর্মীয় আচারঅনুষ্ঠানের দিনক্ষণ বলে দিতে পারতেন। পুণ্যতিথিগুলো সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করতেন। ধর্মীয় বিশ্বাস কাঠামো মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের অপরাপর শ্রমমূলক কাজকে নিম্নস্তরের মনে করে। যেন বাস্তব জীবনের সামাজিক কাজগুলো মানুষের দুঃখ ও যন্ত্রণারও উৎস। কিন্তু ধর্মীয় জীবনের আচার অনুষ্ঠানগুলো যেন এই প্রাত্যহিক জীবন থেকে এক সমষ্টিগত আনন্দ ও উৎসাহ ও উচ্চতর জগতের দিকে অগ্রসর হওয়া। বেশীদূর অগ্রসর হতে হবে না। বাঙালীদের সকলেই সারাবছরের পরিশ্রমের অর্থাৎ নিম্নতর কাজে অংশগ্রহণ করে কিন্তু তাকিয়ে থাকে শারদীয় দুর্গোৎসবের দিকে, অবাঙালীগণ যেমন তাকিয়ে থাকে হোলি উৎসবের দিকে। এইসব ধর্মীয় উৎসবের দিনগুলোতে মানুষ সমষ্টিগত জীবনে অংশগ্রহণ করে, একধরনের সামাজিক চেতনার কাছে নিজেরা নতজানু হয়, একধরনের ব্যক্তি অতিরিক্ত জীবনে অংশগ্রহণ করে। দুর্খায়েম অবশ্য নিজেই বলেছেন যে ধর্ম সম্পর্কীয় তাঁর ধারণা ও সংজ্ঞা যে সকলে গ্রহণ করবে তা নয়। কিন্তু তিনি ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে যে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তা হল ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে মানুষ তার সামাজিক সংঘবদ্ধ চেতনার কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে। সমাজকে সামাজিক চেতনার শক্তিশালী কাঠামোকে ব্যক্তি উচ্চতর চেতনার প্রকাশ বলেই মনে করে। যেকোন ধর্মীয় আচার

অনুষ্ঠানে ও উৎসবের মধ্যে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে লক্ষ্য করলে দুর্খায়েমের ধারণাকে ভ্রান্ত বলা যাবে না।

দুর্খায়েমের মতে, জীববিদ্যাগত ও ভৌতিক কারণ দিয়ে ধর্মের ব্যাখ্যা করা যায় না; দুর্খায়েম ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃতিবাদ বা প্রকৃতি প্রাণময়তাকে বর্জন করেছেন।

পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মা পুজোর থেকে ধর্মের আর্বিভাব হয়েছে একথা দুর্খায়েম স্বীকার করেন না। আবার প্রকৃতির প্রতি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধাকে ধর্মের উৎপত্তি কারণ হিসেবে মেনে নেন নি। দুর্খায়েম ধর্মকে স্বপ্ন, ছায়া, মৃত্যু প্রভৃতি বিষয় দিয়ে ব্যাখ্যা করার বিরোধী। তাঁর মতে সামাজিক গবেষকদের ***কাজ হল সামাজিক বিষয়নিষ্ঠতার ওপর ভিত্তি করে কারণ ও কার্য এবং লক্ষ্য বা কাযাবলী দিয়ে ধর্মকে, তার বিভিন্ন আচার, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানকে বুঝতে হবে। ধর্মের উৎপত্তি স্থল হল সমাজ। ধর্মকে তাই ব্যাখ্যা করতে হবে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ধর্মীয় বাস্তবতাকে দেখতে হবে সামাজিক বাস্তবতা হিসেবে।*** ধর্ম ও সমাজকে কখনই পৃথক করা যায় না; এই ধারণাই দুর্খায়েমকে 'ধর্মের সমাজতত্ত্ব' নিমার্ণে সাহায্য করেছে। তাঁর মতে ধর্ম সেইসব পবিত্র কাজের সঙ্গে, সেইসব মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত যা সমাজের পক্ষে অবশ্য করণীয়।

ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি ধর্মের সঙ্গে সামাজিক বাস্তবতার তিনটি সম্পর্ককেন্দ্রিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ ক) সামাজিকভাবে নির্ধারিত প্রপঞ্চ হিসেবে ধর্ম; খ) সামাজিক সমষ্টিগত চেতনার প্রকাশ হিসেবে ধর্ম; গ) সামাজিক ফলাফলের কার্মিক প্রপঞ্চ হিসেবে ধর্ম অর্থাৎ সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর দিক থেকে ধর্ম।

দুর্খায়েমের মতে ব্যক্তিগত ঈশ্বর বা পয়গম্বর ধর্মের উৎস হতে পারে না। ধর্মের উৎস সামগ্রিকভাবে সমাজ ও সামাজিক চেতনা। ***সমাজের ভিত্তি ধর্ম নয়, ধর্মের ভিত্তিই সমাজ। ধর্ম যেহেতু সামাজিক তাই এর উৎসও সামাজিক।*** ফয়েরবাখ বলেছেন, ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেন নি, মানুষই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে। অথবা মার্ক্সের উদ্ধৃতি ঃ ধর্ম মানুষকে গড়ে না, মানুষই ধর্মকে গড়ে। সমাজ ও ধর্মের মধ্যে এক কার্যকরী সম্পর্ক আছে বলে দুর্খায়েম মনে করেন। ***গোষ্ঠীবদ্ধতা ও সমাজবদ্ধতাই ধর্ম উৎপত্তির আসল কারণ।***

সামাজিক আদানপ্রদান বা মিথস্ক্রিয়াকে দুর্খায়েম সবসময়েই ইতিবাচক মঙ্গলময় শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ধর্মও নিশ্চিতভাবেই এক মঙ্গলময় আদানপ্রদানমূলক সম্পর্ক রচনা করে। এর মধ্যে দিয়ে মানুষের আনন্দ প্রকাশিত। কিন্তু ধর্ম দুর্খায়েমের মতে, অ-অর্থনৈতিক কাজ। এটা মানুষের শ্রম প্রক্রিয়ার বাইরের কাজ। সুতরাং দুর্খায়েমের মতে, সামাজিক বিশ্ব একটি নয়, দুটি: ক) প্রাত্যহিক শ্রমের সামাজিক বিশ্ব খ) প্রত্যহের অতীত সার্মগ্রিক সমষ্টিগত চেতনার বিশ্ব, ধর্ম যার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ।

সমাজ ও সমষ্টিগত চেতনা আসলে দুর্খায়েমের কাছে একই বিষয়; সমাজ হ'ল চেতনার চেতনা। ধর্মও সে ধরণেরই এক সামাজিক চেতনা। দুর্খায়েম বলেন ঃ

> God of believers is only a figurative expression of society.

পবিত্র জিনিস সম্পর্কেও দুর্খায়েম একইভাবে বলেছেন:

> The sacred principle is nothing more nor less than society transfigured and personified

দুর্খায়েমের মতে, 'ধর্মই সমাজ' বা সমাজের সবথেকে আলোকিত দিক; সমাজ ধারণা, সমাজবিশ্বাসই ধর্মীয় বিশ্বাসের রূপ গ্রহণ করে। সমাজ যা চায়, যাকে কাম্য মনে করে, গ্রহণযোগ্য মনে করে ধর্ম আসলে তাকেই সমর্থন করে। সমাজই ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিক কাঠামোর একমাত্র উৎস ও সৃষ্টিকর্তা। *সমাজই ধর্ম তৈরী করেছে, আবার নিজেই সে ধর্মবিশ্বাসী। ধর্মীয় উপাসনার মাধ্যমে মানুষ সমাজকে উপাসনা করে। সমাজ একই সঙ্গে ঈশ্বর ও ঈশ্বরবিশ্বাসী।*

ধর্মীয় উপাদানগুলোর মধ্যে দুর্খায়েম গুরুত্ব দিয়েছেন আচার কাঠামোকে, বিশ্বাস কাঠামোকে ততটা নয়। কারণ বিশ্বাস কাঠামো অনেকটাই ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা বা দর্শন নির্ভর। কিন্তু অনুষ্ঠানগুলো জনগণের বাস্তব প্রয়োজন ও আনন্দ, আবেগ ও সমষ্টিগত চেতনার প্রকাশ ঘটায়।

ধর্মের সামাজিক কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে দুর্খায়েম নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলেছেনঃ

ক) ধর্ম মানুষকে/ব্যক্তিকে শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে শেখায়;

খ) মানুষের সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে;

গ) সামাজিক ঐক্যবিধান করে;

ঘ) নতুন প্রজন্মের মধ্যে ধর্মীয় সামাজিক ঐতিহ্য অনুপ্রবিষ্ট করে;

ঙ) অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের সামাজিক আনন্দানুভূতির সৃষ্টি করে;

চ) মানুষকে তার ব্যক্তিতা থেকে সমষ্টিচেতনার বোধ এনে দেয়;

ছ) একধরনের সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ করে।

সুতরং দেখা যাচ্ছে দুর্খায়েম ধর্মকে সামাজিক আদর্শ হিসেবে দেখেছেন; ভাল মন্দ, স্বর্গ নরক, কাম্য-অকাম্য, ন্যায়-অন্যায় এককথায় পবিত্র অপবিত্র বিষয়গুলো সমাজধর্মকে অনুসরণ করে। ধর্ম আসে তখনই যখন গোষ্ঠী তার রুটিনমাফিক কাজ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে। সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় সবকিছুকে যখন ধর্ম উৎসাহ দেয় তখন বলতেই হবে যে সমাজের ধারণাই ধর্মীয় চেতনার মূল। ধর্মীয় শক্তিকে আবার মানবিক ও সামাজিক শক্তি হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন। *ধর্মীয় শক্তির পুজো করে মানুষ সমাজ শক্তির বা 'সমাজ ঈশ্বরের' পুজো করে। ধর্মীয় প্রতীকগুলো আসলে সমাজের প্রতীক; ধর্মীয় বিশ্বাস সমাজেরই বিশ্বাস; ধর্মীয় সংহতি সমাজেরই সংহতি।*

দুর্খায়েম ধর্মের বাস্তব ভিত্তি অনুসন্ধানের জন্য অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের-'অরুন্টা'র -ধর্ম সম্পর্কে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করেছেন। এদের ধর্ম তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন টোটেমবাদ বা টোটেমপুজো। অবশ্য W. Robertson এবং F.B. Gevons এই মতবাদের প্রবর্তক। দুর্খায়েম অস্ট্রেলীয় আদিম অধিবাসীদের ধর্মকে সরল ও সাদাসিদে বলে অভিহিত করেছেন। এই আদিম সমাজ বেশ কতকগুলো গোষ্ঠীতে বা clan এ বিভক্ত ছিল। এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে রয়েছে স্থির নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য। সকলেই তা মান্য করে। গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত নিয়ম আছে যে গোষ্ঠী মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ; গোষ্ঠীসদস্যরা পরস্পরকে সাহায্য করবে, এটা তাদের কর্তব্য। গোষ্ঠীভুক্ত কোন সদস্য অপর গোষ্ঠী দ্বারা আক্রান্ত হলে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে তার প্রতিরোধ করবে। কারও প্রতি অন্যায় হলে সমষ্টিগতভাবে অপরাধীকে

শাস্তি দেয়া হবে।

দুর্খায়েম দেখিয়েছেন, প্রতিটি গোষ্ঠীর এক একটি টোটেম আছে : প্রাণী বা বৃক্ষ। টোটেম হল প্রতীক; এটা গোষ্ঠীর প্রতীক; এটাই তার পতাকা, এই পতাকা চিহ্নের মাধ্যমে এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠী থেকে নিজেদেরকে পৃথক করে। টোটেম বলতে তাহলে কি বোঝায? টোটেম বলতে বংশচিহ্ন রূপে গৃহীত এবং দেবতা বল পুজিত বিশেষ শ্রেণীর মনুষ্যতর প্রাণী এমনকি বৃক্ষকেও বোঝাতে পারে। আসলে টোটেম বলতে একটা নির্দিষ্ট প্রাণী বা বৃক্ষ না বুঝিয়ে একটা 'শ্রেণী' বোঝায়। এধরনের একটা 'শ্রেণীর' সঙ্গে সামাজিক গোষ্ঠী নিজেদেব অন্তর্ভূক্ত মনে করে। এমনকি তারা মনে করে যে তাদের জীবনের সঙ্গে এইসব প্রাণী বা বৃক্ষের এক রহস্যময় যোগ আছে। সুতরাং টোটেম গোষ্ঠীগত উৎপত্তি ও সংহতির প্রতীক। টোটেম শ্রেণীর জীবেরা শ্রদ্ধা ও পুজোর পাত্র; বিশেষ কোন অনুষ্ঠান ছাড়া টোটেম অভক্ষ্য। টোটেম শ্রেণীভুক্ত প্রাণীরা যেন প্রচন্ড ক্ষমতাশালী এবং টোটেমের সঙ্গে যুক্ত সামাজিক গোষ্ঠীও নিজেদের তেমনি ক্ষমতাশালী ভাবে। টোটেম হল ঈশ্বরের বাহ্যিক প্রকাশ। দুর্খায়েম যুক্তি দিয়েছেন যে টোটেম যদি ঈশ্বর ও সমাজের প্রতীক হয়, তবে সমাজ ও ঈশ্বর কি এক নয়? তিনি তাই সিদ্ধান্ত টানেন যে, ***ঈশ্বরকে (এখানে টোটেমকে) পুজো করে মানুষ আসলে সমাজকেই উপাসনা করছে; সমাজই হল ধর্মীয় শ্রদ্ধার আসল বিষয়।***

মানুষ কেন সমাজকে পুজো করতে চায়? পবিত্র জিনিসগুলো মর্যাদা ও ক্ষমতায় অপবিত্র জিনিসগললো থেকে উচ্চতর জিনিস এবং ব্যক্তি মানুষ থেকে মহত্তর, পবিত্র জিনিসের তুলনায় পার্থিব কর্মপ্রবাহ অনেক নিম্ন পর্যায়ের। মানুষও যেন পবিত্র জিনিসের কাছে নিম্ন পর্যায়ের। ***পবিত্র জিনিস অর্থাৎ টোটেম ও টোটেম নীতি সমূহ এবং মানুষের সম্পর্ক আসলে সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক।*** ব্যক্তির থেকে সমাজ বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও বেশী শক্তিশালী। দুর্খায়েম বলেনঃ

> Primitive man comes to view society as something sacred because he is utterly dependent on it

অর্থাৎ মানুষ সমাজকে পবিত্র মনে করতে শেখে কারণ সে সমাজের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু কেন মানুষ সরাসরিভাবে সমাজের পুজো করে না? কেন সে টোটেমের মতো অতিপ্রাকৃত পবিত্র জিনিসের সৃষ্টি করে তার পুজো করে? টোটেম সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষ শ্রদ্ধামিশ্রিত ভীতিভাবের সৃষ্টি করে মানুষের মনে সমাজ আনুগত্যের সৃষ্টি করে।

টোটেমের ব্যাখ্যা করে দুর্খায়েম গুরুত্ব দিতে চান সামাজিক মূল্যবোধকে , সামাজিক নীতিসমূহকে। এই সব মূল্যবোধ ও বিশ্বাস কাঠামোর অনুপস্থিতিতে সামাজিক শৃঙ্খলা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক সংহতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতা অসম্ভব হয়ে পড়বে। সমাজ বলেই কিছু থাকবে না। ধর্ম এই সমষ্টিগত বিবেকের বাস্তব গ্রহণযোগ্যতা গড়ে তোলে, অবশ্যই শক্তি প্রয়োগ করে নয়, বিশ্বাস ব্যবস্থার নির্মাণ করে। সামাজিক নৈতিকতা ও বিশ্বাস, কর্তব্য ও দায়িত্ব প্রভৃতিতে ধর্মের বা পবিত্রতার স্পর্শ দিয়ে মানুষের কাছে আরো বেশী গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়। সমাজকে উপাসনা করে মানুষ গোষ্ঠীর গুরুত্ব মেনে নেয়,তার ওপর ব্যক্তির নির্ভরশীলতাকে স্বীকার করে। দুর্খায়েম সমষ্টিগত উপাসনার গুরুত্ব দিয়েছেন এজন্য যে এতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব দূর হয়। সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মানুষ সকলের

সাথে নৈকট্য ও সংহতিবোধ করে, গোষ্ঠীর প্রাধান্যের কাছে নতি স্বীকার করে, যেন সে বিরাট সামাজিক গোষ্ঠীর বিরাট যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করছে এমন এক সমষ্টিগত চেতনার বোধ জাগে। এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে অনেকটাই সরে আসে। সামাজিক উপাসনায় সমাজের ঐক্যবৃদ্ধি পায়, বিশেষ শ্রেণীভূক্ত সকলেই নিজেদের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ মনে করে। এভাবে সকলের মধ্যে বৌদ্ধিক, আবেগ ও আনুষ্ঠানিক সংহতি স্থাপিত হয়।

দুর্খায়েম সঠিকভাবেই বলেছেন,যে ধর্মমাত্রই কতকগুলো বিশ্বাস বা মতবাদ নয়, প্রতিটি ধর্মের মধ্যে কতকগুলি তীব্র অনুভূতি ও ভাবাবেগ জন্মলাভ করে এবং কতকগুলো বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ও আচার- আচরণকে কেন্দ্র করে সম্প্রদায় মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন সম্ভব হয়। একই ধর্মমতে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ একই ধরণের আচার অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতায় ও প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করে এবং অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে দিয়ে সামাজিক সংহতি দৃঢ় করে। সমাজকতৃক নির্দেশিত আদর্শ ও কর্তব্য পালনের আচরণকে স্থায়ী রূপ দেয়। সামাজিক আচরণের আদর্শ ধর্মীয় আচরণে রূপ নেয়। এইভাবে দুর্খায়েম সমাজ,ধর্ম,ব্যক্তি সকলকে একই সামাজিক জীবনের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করে ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। দুর্খায়েম লিখেছেন ঃ

> I donot see in divinity anything more than society transfigured and concerned symbolically.

এখানে একটা কথা বলা খুব প্রয়োজন যে দুর্খায়েম ধর্মকে ঈশ্বরমুক্ত করে ধর্মকে এক 'মতাদর্শগত' বিষয় করে তুলেছেন। প্রায় প্রতিটি ধর্মেই ঈশ্বর আছেন কিন্তু ঈশ্বরহীন ধর্মের উপস্থাপনা করে তিনি ধর্মকে সমাজের জন্য এক বৈধ মতাদর্শ করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। ধর্মের সামাজিক ভিত্তিকে উপস্থাপিত করে তিনি সঠিক কাজই করেছেন কিন্তু ধর্ম হল একধরনের ভ্রান্ত বা রূপভ্রষ্ট চেতনা যা বাস্তবকে ভ্রান্তভাবে বা বিকৃতভাবে (false consciousness) উপস্থিত করে। ধর্মীয় চেতনা জগৎ সম্পর্কে বিকৃত চেতনা দিয়ে থাকে। মার্ক্স ধর্মকে সঠিকভাবেই 'opium of people' বলে উল্লেখ করেছেন। ধর্ম আসলে শোষণমূলক সমাজের শোষণ ও অত্যাচারকে মানুষের কাছে সহনশীল করে তুলতে চায়;তাদের ওপর শাসকশ্রেণীর অত্যাচার ও অবিচারকে মেনে নিতে বলে। ধর্ম মানুষের ওপর মানুষের শোষণকে ভুলিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি কাজ করে ঃ

ক) প্রথমত,মৃত্যুর পরে নন্দনকাননে চিরশান্তির প্রতিশ্রুতি দেয়;

খ) দুঃখকষ্টভোগকে পূণ্য বলে ঘোষণা করে;

গ) মানবিক পৃথিবীর সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অতিপ্রাকৃত শক্তির হস্তক্ষেপের কথা বলে;

ঘ) ধর্ম সবসময়েই শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার সমর্থন যুগিয়ে যায়;

ঙ) সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিষয়কে ধর্ম কোন না কোন ভাবে সমর্থন করে যায়। এবং এই ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি 'আমিই চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছি।'

চ) ধর্ম সামাজিক নিয়ন্ত্রণ করে শোষণব্যবস্থাকে এবং শ্রেণীসম্পর্ককে রক্ষার বৈধতা দিয়ে থাকে। যে কোন ধরনের পরিবর্তনের বিরোধিতা করা ধর্মের অন্যতম কাজ। মানুষকে তার

সংগ্রামী মনোভাব পরিত্যাগ করে সামাজিক স্থিতাবস্থাকে মেনে নিতে ধর্ম যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এভাবেই শোষিত শ্রেণীকে তার সমস্যা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে শ্রেণীব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাতে কোন আঘাত না আসে তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করতে চায়।

মার্ক্সও সঠিকভাবে বললে, ধর্মের কার্মিক ব্যাখ্যাই দিয়েছেন;সামাজিকভাবে তার রক্ষণশীল ভূমিকা বা কাজের উল্লেখ করেছেন।

দুর্খায়েমের ত্রুটি এখানেই যে তিনি ধর্মকে সামাজিক বৈধতা দিতে গিয়ে সমাজকে অথবা সামাজিক বাস্তবতাকে বৈধতা দিয়ে ধর্মকে ব্যবহার করেছেন। ধর্ম যে প্রকৃতপক্ষে সমাজসংহতির অনুকূলে সবসময়ে কাজ করে না,তা বিস্মৃত হয়েছেন।

দুর্খায়েমের ধর্ম সম্পর্কে মতামত ধর্মীয় সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে মূল্যবান সংযোজন। কোন কোন নৃতাত্ত্বিক দুর্খায়েম বিশ্লেষিত টোটেমবাদকে ধর্ম বলে মেনে নিতে রাজী হন নি। ধর্ম ঠিক সমাজের উপাসনা নয়,সমাজ-অতিরিক্ত শক্তির উপাসনা। তাছাড়া দুর্খায়েমের ধর্ম সম্পর্কিত ধারণা ছোট এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান রহিত গোষ্ঠী সম্পর্কে প্রযোজ্য কারণ সেখানে কাজ,অবসর,শিক্ষা,পরিবার ও ধর্ম একই আদর্শ ও বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আধুনিক যুগের বৃহৎ সমাজে, বিশেষ করে নগর জীবনে যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবস্থান, সেখানে ধর্ম সামাজিক সংহতির পরিবর্তে সামাজিক বিভেদ বা বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করতে পারে।

পরবর্তী নৃতাত্ত্বিক ম্যালিনোস্কী, দুর্খায়েমের মতকে সমর্থন করেছেন। পরবর্তীতে ডেভিস মুর, এবং পার্সসনর্স ধর্মের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে দুর্খায়েমের মতকেই সমর্থন করেছেন। কিন্তু রবার্ট মার্টন বলেছেন, ধর্ম যে সামাজিক প্রয়োজন মেটায় তা অন্য ব্যবস্থা দিয়েও মেটানো সম্ভব। যেমন ধর্ম যে বিশ্বাস কাঠামোর মাধ্যমে সামাজিক সংহতি রক্ষা করে সাম্যবাদ তার বিশ্বাসকাঠামো গড়ে তুলে একইভাবে সামাজিক সংহতি ও সমষ্টিগত ইচ্ছার বা চেতনার প্রকাশ ঘটাতে পারে।

দুর্খায়েমের রাষ্ট্রতত্ত্ব

Socialism is a cry of grief,sometimes of anger,uttered by men,who feel most keenly collective malaise.

— Durkhiem

যান্ত্রিক বা জৈব সংহতির ধারণা শ্রমবিভাগ গ্রন্থে যেমনভাবে উপস্থিত পরবর্তীকালে দুর্খায়েমের অপরাপর গ্রন্থে তেমন চোখে পড়ে না। তবে একথাও ঠিক যে দুর্খায়েম তাঁর বৌদ্ধিক জীবনে শ্রমবিভাগ সম্পর্কিত ধারণা কাঠামো থেকে খুব একটা সরে আসেন নি। তবে যান্ত্রিক ও জৈব সংহতি সম্পর্কে,বিশেষ করে উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তিনি করেছিলেন,পরবর্তীকালে সে সম্পর্কে নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। The Elementary Forms of Religious Life এ ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আবার যান্ত্রিক সংহতির তত্ত্বই দিয়েছেন। আধুনিক শিল্প সমাজের (Industrial society) আলোচনা করতে গিয়ে জৈব সংহতির তত্ত্ব দিয়েছেন। তবে আধুনিক সমাজের শ্রমবিভাগের জৈবসংহতির ব্যাখ্যাতেই তিনি আর সন্তুষ্ট থাকেন নি। আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রকৃতি ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা জৈব সংহতির ওপর কিভাবে আঘাত হানছে,তারও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। মার্সেল মস বলেছেন,দুর্খায়েমের উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপরে গবেষণামূলক আলোচনা করা কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে নি। তাঁর সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা জার্মানির সংস্কারপন্থী ধারণার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথেমেই তিনি এর উৎপত্তি সম্পর্কে অলোচনা করেন এবং সাঁ সিমোঁর 'সমাজতন্ত্রই' তাঁর আলোচনার মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এখানে উল্লেখযোগ্য, তিনি কোঁৎ কে নয়, সাঁ সিমোঁকে আধুনিক সমাজতন্ত্রের জনক বলে অভিহিত করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি মার্ক্স, লাসালে ও এঙ্গেলসের সমাজতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে মনস্থ করেন,কিন্তু সে পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত হয়নি। সাধারণভাবে হলেও তাঁর লেখাপত্রের মধ্যে মার্ক্সবাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। মার্ক্সীয় বিপ্লব তত্ত্ব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি মনে করতেন যে সিন্ডিকেটগুলো জনগণের মৌলিক অর্থনৈতিক ও নৈতিক উন্নতি করতে পারে; ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর সংঘগুলোকে একটি মাত্র সাধারণ সংস্থায় (one general body) রূপান্তরিত করে সকল সমস্যার সমাধানের ভার তার ওপর অর্পণ করতে হবে। মার্ক্সের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ও শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব তিনি বুঝতে পারেন নি। হয়ত বা বুঝতে চান নি। ফরাসী সমাজতান্ত্রিক জাঁ জওরেস এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পরের চিন্তাভাবনা পরস্পরকে প্রভাবিতও করেছে। দুর্খায়েমের সমাজতন্ত্রের ধারণা হ'ল সংস্কারমূলক সমাজতন্ত্রের ধারণা। মার্সেল মস,ফ্রাকুই সিমিয়াঁদ এবং লুসিয়েলেভি ব্রুল সকলেই সমাজতান্ত্রিক

দলের সদস্য ছিলেন। *L.Humanite* পত্রিকায় এঁদের সমাজতান্ত্রিক আর্দশের ওপরে নানা প্রবন্ধ নিবদ্ধ প্রকাশিত হত। অনেক দুর্খায়েমপন্থীরা এই 'সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা'র বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রচারে অংশগ্রহণও করেছিলেন। তবে এঁদের সমাজতন্ত্রের ধারণা ছিল ভাসাভাসা, শ্রেণীসংগ্রাম বিচ্যুত, শ্রেণীসমন্বয়ের সমাজতন্ত্র। এঁদের অনেকেই সমাজতত্ত্ব আর সমাজতন্ত্রকে এক বলে মনে করতেন। ***তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করতে গিয়ে সমাজতত্ত্বের বিকাশ করা হচ্ছিল।*** ১৮৯০ সাল থেকে ফ্রান্সে মার্ক্সবাদী মতবাদ সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তায় এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে অনেকটাই প্রভাব বিস্তার করে। এই সময় এঙ্গেলস,কাউৎস্কী এবং ল্যাব্রিয়ালার রচনাবলী প্রকাশিত হতে থাকে। সুতরাং সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে দুর্খায়েমের পক্ষে সমাজতন্ত্র বিষয়ে উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না।

দুর্খায়েম সমাজতান্ত্রিক এবং শ্রমিক আন্দোলনকে বিরাট সামজিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করতেন। তিনি বলেছেন যে সাঁ সিঁম ও মার্ক্স আধুনিক সমাজ যে পূর্বতন সমাজ থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পন্ন তা স্বীকার করেছেন এবং নতুন সমাজের মধ্যে যে সংকট দেখা দিয়েছে তার পুনর্বিন্যাসের তত্ত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে সমাজতন্ত্র হল এমন এক আদর্শ যা ন্যায়বোধ এবং শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সাঁ সিমোঁ বা অন্যান্য কল্পবাদীদের সম্পর্কে (শার্ল ফুরিয়ে,রবার্ট ওয়েন) দুর্খায়েমের এই মন্তব্য সঠিক হলেও মার্ক্সের সমাজতন্ত্র সম্পর্কে একথা কখনই প্রাযোজ্য নয়। কারণ মার্ক্স বৈজ্ঞানিকভাবে সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন,পুঁজিবাদী সমাজের বিষয়নিষ্ঠ আলোচনা করেছেন এবং শ্রমিক শ্রেণীকে 'পুজিবাদের কবরখনক' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। শ্রমিক শ্রেণীকে তিনি কখনই সহানুভূতির পাত্র হিসেবে, 'সিন্ডেরেলা' হিসেবে দেখেন নি; নতুন সমাজ গঠনের সক্রিয় সচেতন কর্মকর্তা হিসেবে দেখেছেন।

দুর্খায়েম সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয় সমাজের পরিবর্তনের প্রভাবেই সমাজতন্ত্রের উদ্ভব। আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নৈরাজ্যকর অবস্থা সমাজতন্ত্র আবির্ভাবের প্রেরণা। দুর্খায়েমের ভাষায়,আধুনিক ব্যবস্থায় উৎপাদন পদ্ধতি এমনি এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যার ওপর মানুষের (শ্রমিক শ্রেণী?) কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই সমাজবাদীরা মনে করেন যে অর্থনৈতিক কেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে সমাজে নতুন এবং সচেতনভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব হবে। দুর্খায়েমের ভাষায়ঃ

> Socialists demand the linking of commercial and industrial activities to the directing and conscious agencies of societies.

তবে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বিভিন্নভাবে এই সমাজতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করতে চায়; কিন্তু পার্থক্য সত্ত্বেও দুর্খায়েম মনে করেন যে প্রত্যেক সমাজতান্ত্রিক আদর্শই মূলতঃ অর্থনৈতিক নিয়মের সূত্রাবলী। তাঁর মতে, সাঁ সিমোঁ যখন বলেন যে ভবিষ্যতের সমাজে মানুষের শাসনের পরিবর্তে জিনিসের (বস্তুর) শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে তখন সাঁ সিমোঁ সমাজতন্ত্রকে অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন। একদিকে সাঁ সিমোঁ রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক জীবনের অ-বৌদ্ধিক বিষয়গুলোকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন অপর দিকে তিনি এও

বলেন যে 'রাষ্ট্রকে অতিক্রম' করতে হবে। সাঁ সিমোঁর মতে এটা সম্ভব কারণ রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পূর্ণভাবেই অর্থনৈতিক রূপ নেবে,'রাজনৈতিক আধিপত্য' অতীতের বিষয়ে পরিণত হবে। দুর্খায়েম গুরুত্ব দিয়েই বলেন,অর্থনৈতিক বিষয় রাজনীতির অধীন হবে, এটা সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য নয়, অর্থনৈতিক বিষয়ই রাজনীতির স্থান গ্রহণ করবে।

রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ এ দুটি শব্দকে অনেক সময়ই সমার্থক ভাবা হয়। কিন্তু এ দুটি প্রত্যয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। দুর্খায়েমের মতে, সাম্যবাদ নির্দিষ্ট যুগের বা স্থানের সৃষ্টি নয়; সাম্যবাদী ধারণা, যা কল্পস্বর্গের সৃষ্টি করে,ইতিহাসে বিচ্ছিন্নভাবে এসেছে। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত এই তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ আমরা দেখতে পেয়েছি। সাম্যবাদী চিন্তাভাবনার বিপরীতে সমাজতন্ত্র আপেক্ষিকভাবে নতুন, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যার শুরু। সাম্যবাদী ধারণা ব্যক্তি গ্রন্থকারদের সৃষ্টি; তাঁরা ন্যায়বিচার সম্মত সমাজব্যবস্থার 'নীল নকশা' এঁকেছেন। প্লেটো, মুর এবং ক্যামপান্নলার রচনাবলী এক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে দুর্খায়েম মন্তব্য করেছেন। দুর্খায়েম বলেছেন, সাম্যবাদী চিন্তাভাবনা সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন না ঘটিয়ে ব্যক্তিচিন্তাবিদদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেছে। দুর্খায়েমের ভাষায়ঃ

> They are dreams in which geonerous spirit take delight which draw attention and maintain interest because of their nobility and dignity,but which not answering the real needs felt by the social organigations exist in the imagination and remain practically unproductive.

দুর্খায়েমের মতে,সাম্যবাদের আরও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ঃ

ক) সাম্যবাদ একধরনের নৈতিক তত্ত্ব যাতে বলা হয়েছে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তিই সব মানবিক অশুভের জন্ম দিয়ে থাকে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিই মানুষের 'ব্যক্তিগত আধিপত্য' বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং ঐকের বিরুদ্ধে অপরকে দ্বন্দ্বের মধ্যে নিয়ে আসে। সুতরাং সাম্যবাদীরা মনে করেন যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়কে স্বতন্ত্র করে রাখতে হবে। সুতরাং যারা রাজনৈতিক কর্তৃত্বে থাকবেন তাদের সম্পত্তি প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকবে না; যদি তা থাকে তবে তিনি দুর্নীতির জালে জড়িয়ে পড়বেন। প্রাচীন প্লেটোর রিপাবলিক-এ এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কথাই বলা হয়েছে। প্লেটোর কল্পস্বর্গে শ্রমজীবী ও কারিগরদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে,কারণ তাদের সম্পত্তি রয়েছে। এবং সম্পত্তি থাকার কারণেই তাদের সেনাবাহিনীর অর্ন্তভুক্ত করা যাবেনা বলে প্লেটো মত প্রকাশ করেছিলেন।

খ) রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবর্গকে সম্পত্তির অধিকার দেয়া হবে না কারণ তারা মিতব্যয়ী ও সংঘজীবন যাপন করেন। সাম্যবাদী সমাজে,দুর্খায়েমের মতে ভোগ হল সামাজিক কিন্তু উৎপাদন ব্যক্তিগত।

সমাজতন্ত্র এর বিপরীত তত্ত্ব। সাম্যবাদ সম্পত্তির দুর্নীতিমূলক প্রভাবের ভীতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে আর সমাজতন্ত্র উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করে সকলের জন্য বেশী সম্পদ তৈরীর তাগিদে গড়ে উঠেছে। সমাজতন্ত্র, দুর্খায়েমের মতে,শ্রমবিভাগের থেকে উদ্ভূত সামাজিক পরিবর্তনের ফলাফলকে প্রতিনিধিত্ব করে। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা আধুনিক সমসাময়িক পৃথিবীতে গুরুত্বপূর্ণ কারণ সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদগণ বুঝতে পেরেছেন যে সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে এবং সামাজিক

জীবনের নতুন ধরনের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ দাবি করেছে। তবে দুর্খায়েম সমাজতন্ত্রকে বিজ্ঞান বলতে রাজী নন, এমন কি মার্ক্সের সমাজতন্ত্রকেও নয়। তাঁর মতে, সমাজতন্ত্র একটা প্রায়োগিক কর্মসূচী,কাজের পথনির্দেশক। দুর্খায়েম মনে করেন যে মার্ক্সের Das Capital আধুনিক সমাজতন্ত্রের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ,সবথেকে সুসংবদ্ধ ও চিন্তার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সমাজতন্ত্রকে তিনি রোগের নির্দেশ ও রোগের প্রতিরোধাত্মক ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে,

> Socialism is a cry of grief, sometimes of anger, uttered by men, who feel most keenly, our collective malaise

দুর্খায়েম সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার সমালোচনা করেছেন। প্রথমত,সমাজতান্ত্রিকগণ মনে করেন যে নতুন সমাজের পক্ষে এমন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন যা মূলত অর্থনৈতিক। এর অর্থ সমাজতন্ত্র উপযোগিতাবাদ ও ধনতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিপরীত। সমাজতান্ত্রিকগণ মনে করেন যেঅর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চুক্তির ব্যবহার সমাজের অধঃপতনের কারণ; সুতবাং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর সচেতন নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ দেয়া দরকার। কিন্তু দুর্খায়েম বলেন উপযোগিতাবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়েই নৈতিক নিয়ন্ত্রণের বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেয়নি। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে নৈতিক নিয়মাবলীর প্রয়োজন।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও রাজনৈতিক ক্ষমতার ছেদ বা অতিক্রমণের কথা বলে। এর ফলে রাষ্ট্র তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে। এবং সমাজের অপরাপর সংঘের মতই রাষ্ট্রও একটা সংঘ বলে পরিচিত হবে। কিন্তু দুর্খায়েম বলেন এটা কাম্যও নয় বা বাস্তবসম্মতও নয়।

দুর্খায়েম বলেন,সমাজতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবায়ণের জন্য শ্রেণীসংগ্রামের নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা থেকে উদ্ভূত। অন্যান্য বিষয় হয় ভ্রান্তিবশতঃ অথবা লেখকদের নিজস্ব প্রেরণা থেকে উদ্ভূত। এই মন্তব্য তিনি করেছেন মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু দুর্খায়েম মার্ক্সের মতবাদকে বুঝতে পারেন নি; কারণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে যখন সম্পদের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সামাজিক মালিকানায় রূপান্তরিত হবে। সমাজে যখন বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে,তখন শ্রেণীসংগ্রামকে অস্বীকার করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে কিভাবে? দুর্খায়েমের উত্তর হল সমাজতন্ত্র আসবে ধীরে ধীরে মঙ্গলময় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। অর্থাৎ দুর্খায়েমের সমাজতন্ত্রের ধারণা হল গণতান্ত্রিক বা সংস্কারবাদী। দুর্খায়েমের সমাজতন্ত্রের ধারণাও ইংলন্ডের ফেবীয়পন্থী বা বার্নাস্টিনের সংস্কারপন্থী ধারণার মতই।

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার আলোচনা করেছেন দুর্খায়েম তাঁর Professoinal Ethics and Civic Morals এবং Division of Labour গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে। দুর্খায়েম আধুনিক রাষ্ট্র ও সমসাময়িক রাজনীতির সম্পর্কে আলোচনা করেছেন; সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই রাষ্ট্র আলোচনা করেছেন। ম্যাক্স-হ্বেবার যেভাবে রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগ করার বৈধ কর্তৃত্ব বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন বা মার্ক্স যেভাবে রাষ্ট্রকে এক শ্রেণীর দ্বারা অপরাপর শ্রেণীর শোষণের যন্ত্র বা জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন, দুর্খায়েম সে পথে যান নি। আবার নির্দিষ্ট ভূখন্ডের ভিত্তিতেও রাষ্ট্রকে তিনি দেখেন নি কারণ

তাঁর মতে ভূখন্ডের ধারণা আধুনিক ধারণা যার সঙ্গে রাষ্ট্র ছাড়াও অন্যান্য বিষয় জড়িত। রাষ্ট্রকে কর্তৃত্ব বিভাজনের প্রক্রিয়া হিসেবেও দেখা হয়ে থাকে। এক দল শাসন করে আর এক দল আনুগত্য প্রদর্শন করে। যখন এই রকম অবস্থা থাকে তখনই আমরা রাজনৈতিক সমাজের ধারণা লাভ করি। কিন্তু সব সমাজই রাষ্ট্রনৈতিক নয় আবার সব সমাজে প্রশাসন সংক্রান্ত কর্তৃত্বের বিভাজন দেখতে পাওয়া যায় না। অপর দিকে সমাজের মধ্যেও এমন প্রতিষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায়, যাকে ক্ষুদ্র সংস্করণের সরকারী ব্যবস্থাপনাও বলা যেতে পারে, যেমন রোমান পিতৃতান্ত্রিক পরিবার, যেখানে পরিবার প্রধান ও পারিবারিক সমিতি বর্তমান ছিল।

আবার রাষ্ট্রে এক বিশাল জনসংখ্যার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এরা রাষ্ট্রের অধীন। এটাও দুর্খায়েমের মতে রাষ্ট্রের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নয়, কিন্তু রাজনৈতিক সমাজ একটি নির্দিষ্ট বংশধারার একক নয়,এটা বহু বংশধারার গোষ্ঠী ও সংঘ নিয়ে গঠিত। সুতরাং রাজনৈতিক সমাজের রয়েছে দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ এটা এমন এক সমাজ যা বহুসংখ্যক গৌণ গোষ্ঠীর একত্রে আসার ফল এবং যে গোষ্ঠীগুলো একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অধীন, কিন্তু কর্তৃত্ব অপরের অধীন নয়। সুতরাং রাষ্ট্র হল এমন সব অফিসারবৃন্দ নিয়ে গঠিত যারা রাষ্ট্রনৈতিক সমাজে সরকারী কর্তৃত্বের প্রশাসনিক কার্য করে থাকে। এভাবেই দুর্খায়েম আধুনিককালের গোষ্ঠী তত্ত্বের প্রবর্তন করেছিলেন। আমেরিকার সমাজতান্ত্রিক ও রাজনীতিচিন্তকরা রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দুর্খায়েমের গোষ্ঠীতত্ত্বকে গ্রহণ করেছিলেন।

দুর্খায়েমের মতে,রাষ্ট্র,সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। হেগেলের মতামত অনুসরণ করে দুর্খায়েম বলেন যে রাষ্ট্র সমাজের ওপরে। রাষ্ট্রকে দেখতে হবে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে; রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের কাছে ব্যক্তি নিজেকে নিবেদন করবে। এটা নিশ্চিতভাবেই রাষ্ট্র আধিপত্যের তত্ত্ব। রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করতে না পারলে আসলে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ বিঘ্নিত হবে কারণ রাষ্ট্র কর্তৃত্ব ব্যবহার করেই বুর্জোয়ারা তাদের আত্মস্বার্থ বিকাশ করতে পারে।

দুর্খায়েম রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উপযোগিতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্র সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করেছেন। হেগেলের মতামতের বিপরীতে উপযোগিতাবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ উভয়েই রাষ্ট্র কর্তৃত্বের বিরোধিতা করে; কিন্তু রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে ভিন্ন কথা বলে। উপযোগিতাবাদ ও রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতিবিদদের মতে রাষ্ট্রের কার্যাবলী চুক্তি সংরক্ষনেই সীমাবদ্ধ থাকবে, অন্যসব বিষয়কে বাজার শক্তির 'মুক্ত' কাজ হিসেবেই দেখতে হবে। রাষ্ট্রের কাজ এই মতে নেতিবাচক; ন্যায়বিচার অর্পণের মধ্যেই এর কার্যাবলী সীমাবদ্ধ থাকবে।

সমাজতন্ত্রীরা অর্থনৈতিক জীবনের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পরিধিকে বৃদ্ধি করতে চান, কিন্তু তাঁরা রাষ্ট্রের অতিক্রমণের কথা বলেন এবং মনে করেন যে রাষ্ট্র সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে মিশে যাবে।

দুর্খায়েমের মতে উন্নত ধরনের সমাজে রাষ্ট্র শুধুমাত্র নৈতিক কাজই করে না, তার ভূমিকার বৃদ্ধিও ঘটে। বর্তমানের শ্রমবিভাগজনিত বিকাশের ফলে রাষ্ট্র থেকে সমাজের পৃথকীকরণ ঘটে। রাষ্ট্র ও সমাজের একীকরণ হয়ে যাওয়ার অর্থ হ'ল আসলে একধরনের আধিপত্যবাদের সৃষ্টি হওয়া বলে দুর্খায়েম মনে করেন। এই ব্যবস্থায় বা সমাজে গণতন্ত্র থাকতে পারে না বলে দুর্খায়েম মনে করেন। কারণ সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি যৌথ বিবেকের দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত, যৌথ আধিপত্যের কাছে ব্যক্তি অধীন। শ্রমবিভাগের বিকাশ মানবিক অধিকার বিস্তৃতির শর্ত। আপাতদৃষ্টিতে এটার মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে বলে মনে হয় কারণ রাষ্ট্রের ভূমিকা বৃদ্ধির অর্থই কোন না কোনভাবে ব্যক্তির স্বাধীনতার ওপরে হস্তক্ষেপ নয়,বরং তার বিপরীত; রাষ্ট্র নৈতিক ব্যক্তিত্ববাদকে বাস্তবায়িত করার বাস্তব সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে। দুর্খায়েম বলেন ঃ

Our moral individuality,far from being antagonostic to the state,has on the contrary been the product of it.

এর অর্থ এটা নয় যে রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বাধীনতার ওপরে হস্তক্ষেপ করে না; স্বাধীনতার প্রতি ভীতিপ্রদর্শন করে না। কখনো কখনো করে এবং দুর্খায়েম এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। এ সম্ভাবনার সম্পর্কে সচেতন হয়েই তিনি গণতন্ত্রের তত্ত্ব রচনা করতে গিয়ে পেশাগত সংঘ সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলিত ধারণার তিনি বিরোধিতা করে বলেন যে গণতন্ত্রে রাষ্ট্র দুর্বল নয়,গণতন্ত্রের অর্থ এটাও নয় যে জনগণ সরাসরিভাবে কর্তৃত্বমূলক সিদ্ধান্ত নেবে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে। জটিল বিকশিত সমাজে নিচিশ্চতভাবেই অল্পকয়েকজন ব্যক্তি নিয়ে সরকার গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা দরকার। দুর্খায়েমের ভাষায় পৌর সমাজে ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ ও সমন্বয়ের যন্ত্র হিসেবে কাজ করে রাষ্ট্র। তাঁর মতে রাষ্ট্র হল চেতনার সংস্থা। বিচ্ছিন্ন সব ধারণা ও আবেগের দ্বারা বশীভূত না হয়ে রাষ্ট্র বৌদ্ধিকভাবে তার ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্র নাগরিকদের চিন্তাভাবনার প্রতি নিশ্চিতভাবেই সাড়া দেবে,কিন্তু সেইসব চিন্তাভাবনাকে স্পষ্টভাবে ও বৌদ্ধিকভাবে তুলে ধরবে। গণতান্ত্রিক সমাজ হ'ল এমন ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রকে স্বাধীন এবং শক্তিশালী হতে হবে যাতে সে তার বৌদ্ধিক কাজ করতে পারে। কিন্তু দুর্খায়েম জোর দিয়ে বলেছেন যে জনগণের চিন্তাভাবনার সঙ্গে রাষ্ট্র সংযোগ রাখবে। গণতন্ত্র এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যার মধ্যে সমাজ 'সচেতনতা' লাভ করে। আলাপ আলোচনা, সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তির যতবেশী উৎসাহ দেয়া হবে, জাতি ততই গণতান্ত্রিক হয়ে উঠবে। পুরোনো বিশ্বাস বা সংস্কার বেশীমাত্রায় থাকলে এবং অনুসন্ধিৎসার অভাব থাকলে গণতন্ত্র বিকশিত হতে পারে না, সাফল্য লাভ করতে পারে না। যে সমাজে রাষ্ট্র দুর্বল,সেখানে প্রথা বা অভ্যাসের প্রাবল্য বেশী। প্রথা যেখানে প্রবল সেখানে পরিবর্তনের প্রতি অনীহা লক্ষ্য করা যায়। আসলে দুর্খায়েম এসব কথা বলেছেন উনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সের পটভূমিকায়।

কিন্তু রাষ্ট্রে অতিরিক্ত প্রভাবের ওপর যদি সীমা আরোপ না করা যায় তবে পৌর সমাজের অধিবাসী ব্যক্তিকে কীভাবে রাষ্ট্রের অনির্দিষ্ট ও অনিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা যাবে? এখানেই প্রশ্ন আসে মুখ্য ও গৌণ গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার। বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থাগুলো আধুনিক সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্র তখনই অত্যাচারী হয়ে ওঠে বা উঠতে পারে যখন এইসব সংস্থাগুলো যোগ্যতার সাথে তাদের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। কারণ আধুনিক সমাজে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় সংঘগুলোর কাজের মাধ্যমে। ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে 'বাফার' বা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গোষ্ঠীগুলোর বা সংগঠনগুলোর ভূমিকা বিরাট। সংঘগুলোই রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের

ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে। এই সংঘগুলোই রাষ্ট্র থেকে সমাজের দূরত্ব বজায় রাখে যাতে করে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষণশীলতায় পরিণত না হতে পারে।

জৈব সংহতিব তত্ত্ব দিতে গিয়ে দুর্খায়েম সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন সংস্থাগুলোর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন। দুর্খায়েম উল্লেখ করেছেন যে যান্ত্রিক সংহতি যেভাবে নৈতিক শৃঙ্খলায় সকলকে বন্ধনের মধ্যে রাখতো, একধরনের সর্বগ্রাসময় কর্তৃত্ব শৃঙ্খলে সকলকে একই ধরনের চিন্তা বা আদর্শ অনুসরণে বাধ্য করতো,সে যুগে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু উপযোগিতাবাদিরা ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক যে সম্পর্কের কথা বলেছেন তাতেও দুর্খায়েমেব সায় নেই। তাঁর বিশ্বাস হল নৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে যেখানে সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তি কাজ করে যাবে। কিন্তু কিভাবে এটা বাস্তবায়িত হবে তার কোন পথনির্দেশও তিনি দিতে পারেন নি। তিনি রাষ্ট্র কর্তৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেও বলেন যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক সংস্থাগুলো যে ভূমিকা পালন করে তা রাষ্ট্র থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমবিভাগের প্রক্রিয়ায় 'Corporate groups' গুলোর ভূমিকাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মন্তব্য করেন। মধ্যযুগের অর্থনীতিতে পেশাগত গোষ্ঠীগুলোও বিরাট ভূমিকা পালন করত। শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক নিয়ম ও অনুশাসনে বেধে দিতে পারতো। কিন্তু পুরোনো গিল্ডপ্রথার অবসান হয়ে গেছে; আধুনিক বৃহদায়তন শিল্প উদ্ভবের ফলে পুরোনো গিল্ড প্রথায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। দুর্খায়েম বলেন শ্রমিক সংঘগুলোর পক্ষে নৈতিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় কারণ সেগুলো দ্বন্দ্বশীল গোষ্ঠী; নৈতিক সম্প্রদায় নয়। দুর্খায়েম বলেন পেশাগত গোষ্ঠীরাই সেই নৈতিক ভূমিকা পালন করতে পারে কারণ এই গোষ্ঠীগুলো ব্যক্তির অবশ্যপালনীয় কতকগুলো 'নৈতিক মূল্য' নির্ধারণ করে। এই গোষ্ঠীগুলোর পক্ষে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা সম্ভব বলে দুর্খায়েম মনে করেন। ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংঘগুলো সম্পর্কে দুর্খাযেমের দৃষ্টিভঙ্গির কারণ সহজেই বোঝা যায়। শ্রমিক সংঘগুলো বুর্জেয়ো ব্যবস্থার বিরোধী শক্তি; আন্দোলন করা তাদের মৌলিক অধিকার; ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের সচেতনতা নতুন সমাজ সৃষ্টির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। দুর্খায়েম চান না যে শ্রমিব সংঘগুলো অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে উঠুক। তাহলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আঘাত আসবে। তাই শ্রমিক সংঘের পরিবর্তে তিনি পেশাগত গোষ্ঠীর ওপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। এবং সেই কারণেই রাষ্ট্রকেও তিনি মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা দিয়েছেন। এভাবেই তিনি আধুনিক কালে যে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজতত্ত্ব (political sociology) নামে নতুন সমাজরাষ্ট্র আলোচনার ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে, তার সূত্রপাত করেছেন।

দুর্খায়েমের অবদান

Durkheim was a scientific theorist in the best sense of one who never theorised in the air, never indulged in the speculation but was always seeking the solution of crucially important empirical problems. —Talcot Parsons.

অগাস্ত কোঁৎ এর পরে দুর্খায়েম সমাজতত্ত্বের আলোচনার বিষয়কে বৈজ্ঞানিক ও বিষয়নিষ্ঠ শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তুর ও পদ্ধতির ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং কোঁৎ এর ইষ্টবাদী তত্ত্বকে সামাজিক তথ্যের বৈজ্ঞানিক আলোচনার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গোষ্ঠী ও সমষ্টিবাদের গুরুত্বকে তিনিই প্রথম অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে সামাজিক উপাদানই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সামজতাত্ত্বিক উপাদান (Social facts are the most important sociological factors.)। মানুষের চিন্তা ও অনুভূতি সামাজিক চেতনারই ফল। গোষ্ঠী বা সমাজই মানুষের আচরণ,চিন্তাকাঠামো ও দর্শনের উৎপত্তি স্থল। গোষ্ঠী বা সমাজই মানুষের ঈশ্বর। মানুষের সামাজিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে কোঁৎ এর ইষ্টবাদের ত্রুটি তিনি দুর করার চেষ্টা করেছেন। কোঁৎ এর সমাজচিন্তার অবরোহ পদ্ধতিকে বর্জন করে দুর্খায়েম আরোহ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। সামাগ্রিক শ্রমবিভাগের ক্ষেত্রে তিনি স্পেনসার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন ঠিকই, তবে শ্রমবিভাগের বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় দুর্খায়েম স্পেনসারকেও অতিক্রম করেছেন। শ্রমবিভাগ আলোচনার ক্ষেত্রে দুর্খায়েম যথেষ্ট মৌলিকতা দেখিয়েছেন।

দুর্খায়েম সংস্কারবাদ ও বিবর্তনবাদের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু সমষ্টিগত চাপ এবং সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন নি। বিশেষ করে আত্মহননের তত্ত্বে তিনি ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর যথার্থ গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। নৈতিকতা সম্পর্কে তত্ত্ব দিতে গিয়েও তিনি ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে বলেছেন,নৈতিকতা একেবারে বিষয়গত বিষয়, বিষয়ীগত নয়।

বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক পিতিরিম সরোকিন দুর্খায়েমের সমাজতাত্ত্বিক অবদান সম্পর্কে কয়েকটি সমালোচনামূলক মন্তব্য করেছেনঃ

১) সামাজিক কারণের ওপরে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেবার ফলে দুর্খায়েমের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা জলবায়ুগত ও ভৌতিক উপাদানগুলোকে অস্বীকার করেছে।

২) ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে টোটেম দ্বারা সবকিছু নিয়ন্ত্রিত বলে দুর্খায়েম মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ভৌতিক ও ভৌগোলিক বিষয়ও স্বর্গ,নরক,ভাল-মন্দ প্রভৃতি বিষয়কে প্রভাবিত করে বা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় ইসলাম ধর্মগ্রন্থ কোরাণে ঈশ্বরকে

মরুভূমির মতই ক্রুর দেখানো হয়েছে। বাস্তবজীবনের রুক্ষতার সঙ্গে লড়াই করার অভিজ্ঞতা থেকেই স্বর্গরাজ্যের শস্যশ্যামল নদীমাতৃক ছবি উপস্থিত করা হয়েছে।

৩) দুর্খায়েম প্রাকৃতিক বিষয়কে স্থিতিশীলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। গতিশীলতার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি ও সমাজকে ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল।

সরোকিনের সমালোচনার মধ্যেও ভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। দুর্খায়েম সমাজতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক করে তুলেছিলেন। গতিশীলতা তাঁর তত্ত্বে অনুপস্থিত এমন বলা যায় না। তবে তিনি সামাজিক স্থিতির ওপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

সমাজতত্ত্বে দুর্খায়েমের কার্যকরী প্রভাবকে সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনিই সমাজতত্ত্বের মৌলিক সমস্যাকে সকলের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। সমকালীন ফ্রান্সে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল খুবই; পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকাতে তার চিন্তাধারা প্রসার লাভ করে। ফ্রান্সে লেভি স্ত্রসের সংগঠনবাদ কিংবা আমেরিকার সমাজতাত্ত্বিকদের ক্রিয়াশীলতাবাদের তত্ত্ব কমবেশী দুর্খায়েম প্রভাবিত।

সমাজের প্রকৃতি তার সংহতিমূলক চরিত্র, তার সাময়িক বিকারগ্রস্ত অবস্থা, সামাজিক চেতনার মৌল বৈশিষ্ট্য ও তার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা, সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান পদ্ধতি, বিজ্ঞান হিসেবে সমাজতত্ত্বের স্বীকৃত মর্যাদা সবকিছুকেই দুর্খায়েম এক ব্যাপক দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের আলোকে দেখেছেন। এইসব সমস্যা ও তার সমাধান তাত্ত্বিক ও ফলিত সমাজতত্ত্বের মৌলিক বিষয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং দুর্খায়েম প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ের সূত্রপাত করেছিলেন। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে মার্ক্সীয় মতবাদ ও সমাজপদ্ধতি আধুনিক বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বের ওপর গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী প্রভাব ফেলেছে। আধুনিক যুগে মার্ক্স, দুর্খায়েম, হেবার ও প্যারেটোর চিন্তাধারা সামাজিক ঘটনাবলীর ও সমস্যা সমূহের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা এবং প্রায় বিপরীতমুখী উত্তর সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে।

দুর্খায়েমের সমাজতাত্ত্বিকতা (Sociologism) আধুনিক সমাজতত্ত্বের অন্যতম মৌলিক বিষয়, বিশেষ করে সাংগঠনিক ক্রিয়াশীলতা তত্ত্বের তাত্ত্বিক ভিত্তি তো দুর্খায়েমই যুগিয়েছেন; সাংগঠনিক ক্রিয়াশীলতা তত্ত্বের পদ্ধতিগত বিশ্লেষণও দুর্খায়েমের মধ্যেই পাওয়া গেছে। সমাজকে আত্মসংরক্ষিত ব্যবস্থা হিসেবে দেখার যে তত্ত্ব পার্সনস্, মার্টন প্রমুখেরা বিশদায়িত করেছেন তার উৎসমুখ হলেন দুর্খায়েম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার যে কার্যকরী তত্ত্ব আজকের যুগের সমাজতত্ত্বের অন্যতম আলোচ্য বিষয় তা দুর্খায়েমের কাছ থেকেই এসেছে। সামাজিক বিভিন্ন ঘটনা যে পরস্পর সংযুক্ত একটি ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক অংশ যে তার নির্দিষ্ট কার্যাবিলী করে থাকে এবং সমগ্রের সংরক্ষণে নিযুক্ত থাকে দুর্খায়েমই আমাদের তা জানিয়েছেন। সমাজ আলোচনার যে দরজা দুর্খায়েম খুলে দিয়েছেন তা ক্রিয়াশীলতাবাদের তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সামাজিক সমস্যা এবং তার সামাজিক উৎস সম্পর্কে দুর্খায়েম যা বলেছেন, আধুনিক অনেক অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক তার সঙ্গে মার্ক্সীয় সামাজিক চিন্তার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। দুর্খায়েমের সমাজপদ্ধতি ও মার্ক্সের সমাজপদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করে তাঁরা দেখানোর চেষ্টা করেছেন, মার্ক্স ও দুর্খায়েম উভয়েই সমষ্টিবাদী ও বস্তুবাদী। পল বার্থ বলেছেন যে মার্ক্সের মতবাদ ও দুর্খায়েমের 'সমাজতত্ত্ববাদ' আসলে একই চিন্তার প্রকাশ। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকগণের

অনেকে এটাও বলেছেন যে সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মার্ক্স ও দুর্খায়েমের পথনির্দেশের ক্ষেত্রে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মার্ক্সের কিছু লেখা দুর্খায়েমের পরিচিত ছিল, তিনি মার্ক্সের পুঁজি গ্রন্থটি পড়েছিলেন এবং এর গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন। তবে তিনি মার্ক্সবাদের প্রতি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। তিনি মার্ক্সবাদের সমালোচনা করেছেন এই বলে যে এটা হল নির্দেশ্যবাদের তত্ত্ব। তাঁর অভিযোগ, মার্ক্সবাদে অর্থনৈতিক বিষয় সামাজিক অপরাপর বিষয়কে নির্ধারণ করে। তিনি আরো বলেছেন যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর চিন্তাভাবনার প্রভাবকে মার্ক্স অস্বীকার করেছেন। এভাবেই দুর্খায়েম মার্ক্সবাদকে দেখেছেন বা সঠিক বললে মার্ক্সবাদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করেছেন।

সামাজিক জীবনের 'বিষয়গততা'র গুরুত্ব সম্পর্কে দুর্খায়েম সচেতেন কিন্তু মার্ক্সের 'সামাজিক বিষয়গততা'র সঙ্গে দুর্খায়েমের পার্থক্য রয়েছে। দুর্খায়েম সামাজিক তথ্যগুলোকে নৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত করে ব্যাখ্যা করেছেন। সামাজিক বিষয়গত বিষয়গুলোকে তিনি ব্যক্তি চেতনা থেকে মুক্ত করতে চান এবং বলেন, এগুলোর ব্যক্তিনিরপেক্ষ চরিত্র আছে। সমষ্টিগত চেতনা (conscience collective) ব্যক্তি চেতনা নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল একথাই তিনি বলেন। মার্ক্সের 'বিষয়গততা' সম্পর্কে ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। মার্ক্স সামাজিক বিকাশকে সামাজিক-অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করেন। মার্ক্স মানুষের ইতিহাসকে/সামাজিক ইতিহাসকে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত চেতনার ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন না। অবশ্য মার্ক্স অর্থনৈতিক বিষয়ের প্রধান্যস্বীকার করলেও অপরাপর সামাজিক বিষয়ের,অর্থাৎ চিন্তাভাবনা,ধ্যানধারণা, মতাদর্শ, জাতিগত, শ্রেণীগত, গোষ্ঠীগত বিষয়গুলোকে অস্বীকার করেন নি। মার্ক্সবাদ সেই অর্থে কোন নির্দেশ্যবাদী তত্ত্ব নয়। এটা সামাজিক বিভিন্ন ঘটনার মিথষ্ক্রিয়ার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। মার্ক্স যখন অর্থনীতির কথা বলেন, তখন রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, মতাদর্শ সবকিছুই আলোচনা করেন। Das Capital শুধু পুঁজির আলোচনা নয়, এর মধ্যে রাজনীতি, দর্শন, সামাজিক সম্পর্ক সবকিছুই রয়েছে। দুর্খায়েম পুঁজি গ্রন্থের রচয়িতার মতামত বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। আবার যারা দুর্খায়েমের সঙ্গে মার্ক্সবাদের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন তারাও সঠিক ব্যাখ্যা করেন নি।

দুর্খায়েম অর্থনৈতিক বিষয়কে দেখেছেন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে; অর্থনীতিকে তিনি প্রকৌশল বিদ্যা বা 'কলাকৌশল' বলে মনে করেছেন; তাঁর মতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গভীর ও দৃঢ় সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করে না; তাঁর মতে অর্থনৈতিক কাজকর্ম 'asocial'। ঐতিহাসিকভাবে তিনি যে সামাজিক টাইপের ব্যাখ্যা করেছেন তা বস্তুসংস্থানগত, জনসংখ্যাগত ও মতাদর্শগত উপাদানের সমষ্টি; মতাদর্শগত উপাদানকেই তিনি সামাজিক ব্যবস্থার নির্ধারক শক্তি বলে মনে করেছেন। দুর্খায়েমের 'সামাজিক টাইপ' এর সঙ্গে মার্ক্সের সামাজিক অর্থনৈতিক বিন্যাসের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। মার্ক্সের সামাজিক অর্থনৈতিক বিন্যাসের সবথেকে গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হল উৎপাদন সম্পর্ক এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের বিভক্তিকরণ। মতাদর্শগত ও তাত্ত্বিক বিষয় কোন না কোন ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান ও স্বার্থের প্রতিফলন. ছাড়া আর কিছুই নয়।

দুর্খায়েমের সামাজিক সমগ্রের ধারণার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সমষ্টিগত বিবেক। এই সামাজিক বিবেকের উৎপত্তি হয়েছে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির মিথষ্ক্রয়ার ফল হিসেবে, ঐতিহাসিক

মূর্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে তা হয় নি। সামাজিক বিবেকের সঙ্গে দুর্খায়েম মানুষের মূর্ত ঐতিহাসিক কর্মপ্রক্রিয়াকে যুক্ত করেন নি। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে তিনি সামাজিক সমষ্টিগত সমাবেশ, ধর্মনৈতিক উৎসব পালন আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। আসলে দুর্খায়েম সামাজিক সম্পর্কের আদর্শবাদী ব্যাখ্যা করেছেন। এই সম্পর্কগুলোকে সংহতি,সহযোগিতা প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল সম্পর্ক হিসেবে দেখেছেন। সামাজিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধকে তিনি সমাজের স্বাভাবিক অবস্থার ভাঙ্গন বলে মনে করেছেন। দ্বন্দ্বকে সমাজের স্বাভাবিক বিষয় না বলে স্বাভাবিক অবস্থার বিচ্যুতি হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে,দ্বন্দ্ব বা বিরোধ দূর করার জন্য প্রচলিত সমাজ সমগ্রের পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। মার্ক্সের সঙ্গে এখানেই তার মৌলিক পার্থক্য। মার্ক্সের মতে শ্রেণী সমাজে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী; আর এই দ্বন্দ্ব প্রচলিত সমাজকাঠামোর পরিবর্তন করেই দূর করা সম্ভব। সুতরাং দুর্খায়েমের 'সমাজতাত্ত্বিকতা' মার্ক্সবাদের চরিত্র থেকে শুধু স্বতন্ত্রই নয়,বিরোধীও বটে। সামাজিক সংকটের বিভিন্ন ব্যাপারকে দুর্খায়েম ধরতে পেরেছিলেন ঠিকই,তার অ্যানোমির ধারণার সঙ্গে মার্ক্সের বিচ্ছিন্নতার আপাতসাদৃশ্য থাকলেও তাদের বিশ্লেষণ ধারার পার্থক্য থেকেই গেছে। সামাজিক ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো দূর করে অ্যানোমির অবসান করা যাবে বলে দুর্খায়েমের ধারণা আর মার্ক্সের ধারণা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবস্থার অবসান না করে বিচ্ছিন্নতা দূর করা যায় না।

এছাড়া দুর্খায়েমের মৌলিক সমাজতাত্ত্বিক বিষয় ছিল সামাজিক সংগঠনের অস্তিত্বের সংরক্ষণ করা,তাকে সংস্কার ও উন্নত করা,তার ধ্বংস করা নয়। ***দুর্খায়েমের সমাজতত্ত্ব তাই স্থিতাবস্থার সমাজতত্ত্ব। দুর্খায়েম তার সমাজতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজের 'নানা অসুখের' উল্লেখ করেছেন কিন্তু কিভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করা যায় তার জন্যই তিনি তাঁর সমাজতত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। এটা তাই কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকগণ বিশেষ করে ট্যালকট পার্সনস্,ডানিয়েল বেল, সামুয়েল লিপসেট,রবার্ট নিসবেথ,স্যামুয়েল হান্টিংটন প্রমুখেরা বর্তমান সমাজব্যবস্থার সংরক্ষণের তত্ত্ব দিতে গিয়ে দুর্খায়েম প্রসঙ্গ টেনেছেন।***

ফরাসী মার্ক্সবাদী লেখক মাইকেল ভিয়ন **Sociology and Ideology** গ্রন্থে ***'সমাজতত্ত্বকে আজকের যুগের যুদ্ধ ক্ষেত্র'*** বলে বর্ণনা করেছেন। হয় সমাজতত্ত্ব পুরোনো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করবে ও সংরক্ষণ করবে, অথবা একে পরিবর্তন করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের দিকে তার সমর্থনের হাত এগিয়ে দেবে। তবে একথা ঠিক যে ভিয়ন দুর্খায়েমকে অতিবামদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টাও করেছেন। তিনি বলেন দুর্খায়েমের মধ্যে যে স্ববিরোধিতা দেখা যায় তা এজন্য যে তিনি ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীভূক্ত বুদ্ধিজীবী; আর বুর্জোয়া শ্রেণী বিশ্বাস করে বা করাতে চায় যে বুর্জোয়া সমাজ এবং এর মূল্যবোধ চিরস্থায়ী। এখানেই দুর্খায়েমের স্ববিরোধিতা। কিন্তু দুর্খায়েমের সমাজতত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক ও বিষয়ীগত ধ্যানধারণার বিরোধী। জীববিজ্ঞানগত মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণের বিরোধিতা করে সমাজতত্ত্বকে যেভাবে তিনি কাল্পনিক বিমূর্ত চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত করেছিলেন,সমাজতত্ত্বকে প্রকৃত বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস করেছিলেন তা সমাজতত্ত্বের এক স্থায়ী সম্পদ হিসেবেই থেকে যাবে। তবে মার্ক্সীয় সমাজবিশ্লেষণের বর্ণাঢ্যতার তুলনায় দুর্খায়েমের সমাজতত্ত্বকে পদ্ধতিগত ও তত্ত্বগত উভয় দিক থেকেই অগভীর মনে করার কারণ আছে, অস্বীকার করা যায় না।